বাংলাপিডিএফ

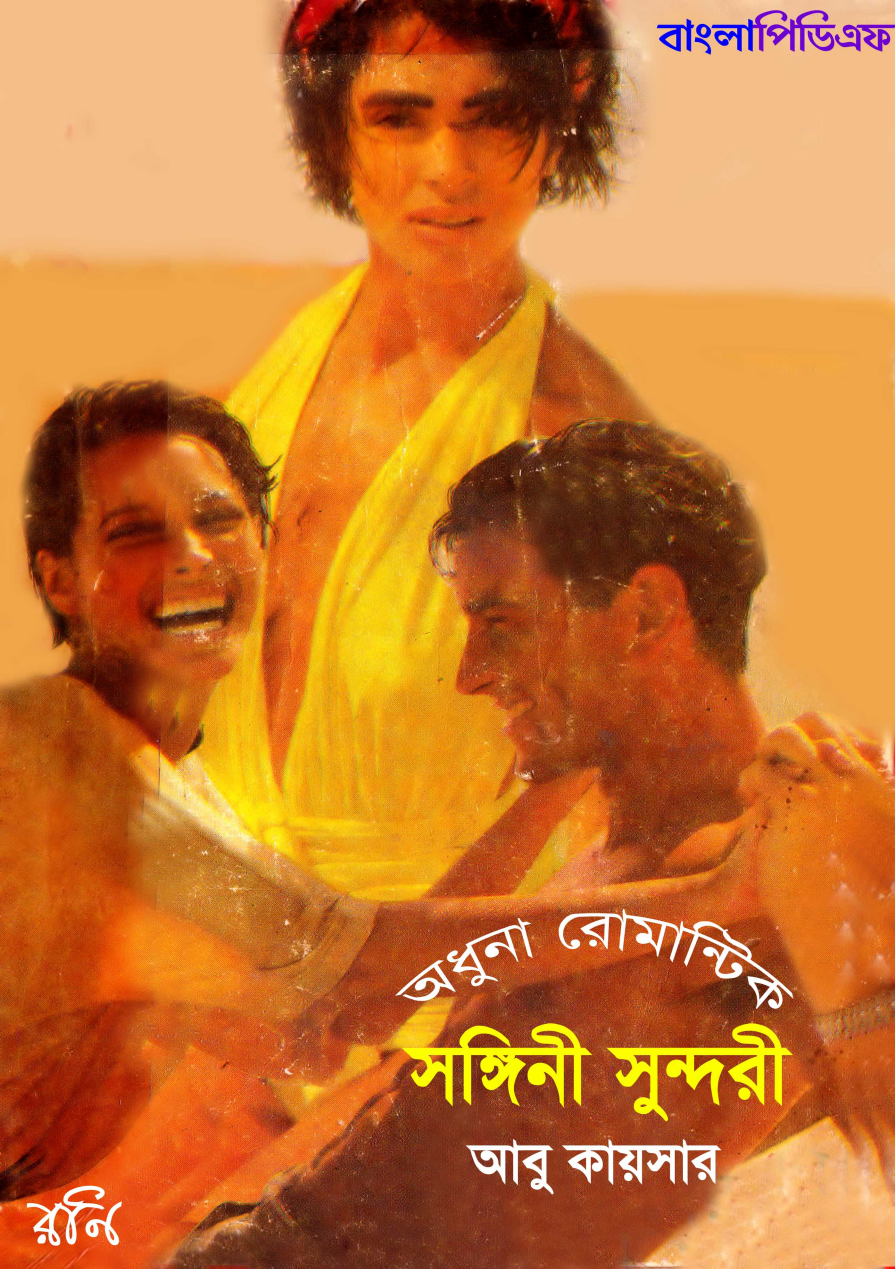

অধুনা রোমান্টিক

সঙ্গিনী সুন্দরী

আবু কায়সার

রনি

বাংলাপিডিএফ

অধুনা রোমান্টিক-১

সঙ্গিনী সুন্দরী

আবু কায়সার

মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেলো লা গ্রাণ্ডার যাবার পথে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেলো লিণ্ডা লেনী। জ্ঞান ফিরে আসতেই করিম আল খালিদের কোলের ওপর চমকে উঠলো অপরূপা ইংরেজ মেয়েটি। হুবহু ডন রামোসের মতো চেহারার এই ভয়ঙ্কর সুন্দর মানুষটি আসলে কে?

করিম ওকে নিয়ে ওঠলো নিজের দুর্গো-প্রাসাদ কাস্টি-লোতে। শুরু হলো রাজকীয় বন্দী-জীবন। করিমের মনের প্রাসাদে বন্দী হলো লিণ্ডা। কিন্তু লিণ্ডার মনে ডন রামোসের প্রতিবিম্ব।

স্পেন থেকে মরক্কোয় উড়ে চললো আল খালিদের নিজস্ব বিমান। সঙ্গে তার লিণ্ডা!

ফেজ নগরীর শেষ প্রান্তে ফুলে ভরা মরুকুঞ্জে বেদুইন সর্দারদের আনাগোনা। কী যেন একটা উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। উৎসব না হত্যাকাণ্ড? প্রশ্ন জাগে লিণ্ডার মনে। পালাবার পথ খোঁজে সে। কিন্তু মন চুরি করে পালানো কি এতোই সোজা?

দাম : আটাশ টাকা

অধুনা

রনি

অধুনা রোমান্টিক-১

সঙ্গিনী সুন্দরী

আবু কায়সার

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

অধুনা

অধুনা রোমান্টিক—১
কাহিনী : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৮৯
স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক :
অধুনা প্রকাশনের পক্ষে
ফরিদ আহমেদ
২০ শেখ সাহেব বাজার
আজিমপুর, ঢাকা—১২০৫

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

মুদ্রণ :
সুরমা আর্ট প্রেস
আজিমপুর, ঢাকা—১২০৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
হামিদুল ইসলাম

পরিবেশক :
কারেন্ট নিউজ ঢাকা কলেজ গেট, ঢাকা। ঢাকা হকার্স সমবায় সমিতি লিঃ। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ডানা পাবলিশার্স বাংলাবাজার, ঢাকা। মিশুক প্রকাশনী, কারেন্ট বুক সেন্টার চট্টগ্রাম। ইউনিভার্সিটি বুক ডিপো রাজশাহী। এছাড়াও দেশের সর্বত্র বুকস্টল ও ম্যাগাজিন কর্নারসমূহে পাওয়া যায়।

১

সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে রাস্তাটা। দু'পাশে সারিবদ্ধ গাছ। সবুজ জলপাই আর উজ্জ্বল করবীর শ্রেণীবদ্ধ সৌন্দর্য দেখলে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। সেই সঙ্গে মনটাও। বার বার বাঁক নিয়েছে সড়কটা। শেষ হয়েছে গিয়ে দূরের পাহাড়ে। সেখানে, এক প্রস্তরময় মালভূমিই মেয়েটির গন্তব্য।

আঁকাবাঁকা পথে গাড়িটা ছুটছে। চাকার ঘষায় পেছনে পুঞ্জীভূত হচ্ছে ধুলোর মেঘ। বাঁ দিকেই সমুদ্র। অমসৃণ সৈকতটিও যেন রাস্তার পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে সমুখের দিকে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঝুলে আছে পাথুরে ঘরবাড়ি। কোনো কোনো বাড়ির সামনে কৌতূহলী মেয়েদের ভীড়। কালো বোরখা পরনে তাদের। চোখের মনি কালো। চোখের উপর আঙুলগুলোকে আড়াআড়িভাবে রেখে তারা তাকিয়ে আছে ধাবমান গাড়িটির দিকে। কিন্তু ভালোভাবে কিছু ঠাহর করা সম্ভব নয়। কেননা গাড়িটা ছুটছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

পুরো ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মতোই মনে হচ্ছে লিণ্ডার

কাছে। স্বপ্নের সূত্রপাত তো প্লেনে ওঠার আগেই। কিন্তু শূন্য পথে ভ্রমণ শেষ করে ভূমিতে নেমে আসার পরও যেন সেই ঘোরটা কাটছে না। এটাই লিণ্ডার প্রথম বিমান ভ্রমণ। কিন্তু প্লেনে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। সে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এলো টার্মিনালের বাইরে। মনোরম সূর্যালোক গায়ে মেখে লাইনে দাঁড়ালো। অপেক্ষা করতে থাকলো ক্যাবের জন্যে।

কিছুক্ষন আগেই গাড়িতে উঠেছে লিণ্ডা। গাড়িটা তীব্র গতিতে ছুটে চলছে সমুদ্র-তীর ঘেঁষে। রাস্তার বাঁ দিকেই বাহিয়া উপসাগর। স্থানীয় নাম শংখ সাগর। কী চমৎকার নাম। আকাশের নীল একাকার হয়ে গেছে সাগরের নীলে। গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে মাঝে মাঝেই ঝাপ্টা লাগছে বাতাসের। বাতাসে মিশে আছে এক আশ্চর্য দেশের আশ্চর্য মাটির গন্ধ। যে দেশের ইতিহাসটাই প্রাচীন, উষ্ণ আর আবেগময়। যদিও সে ইতিহাসের সূচনাপঠটি আদিম। এবং আজকের দিনেও দেশটি লাবন্যময় করবী আর সাদা বাড়ির শীর্ষে সন্নিবিষ্ট রেশম-লাল জেরানিয়ানের জন্যেই বৈশিষ্টমণ্ডিত নয়। অতীতের ছায়া এখনো যেন ছড়িয়ে আছে এই দেশটির সর্বত্র। একদা এখানেই মানুষের রক্তে ভিজে উঠতো বুল্-রিংয়ের বালু। হিংস্র ষাঁড়ের গর্জন যেন এখনো শোনা যায় বাহিয়া উপসাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। পবিত্র ক্রুশের গোপন বিচারালয়, এখনো যেন ছায়া ফেলে

আছে স্থানীয় জনমনে। আজকের দিনেও ভাব গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপিত হয় নানা রকম ধর্মীয় দিবস। সন্ন্যাসীরা দড়ির টুকরো দিয়ে নিজেদের শরীরে আঘাত করতে করতে পথ— পরিক্রম করে। শ্বেত সোনালী সূর্যের নিচে কালো চোখ আর বিষন্ন সঙ্গীতের দেশ। যে কোনো বিদেশী পর্যটকের কাছেই যা আকর্ষণীয় এবং কৌতুহলোদ্দীপক।

গাড়ির জানালা দিয়ে লিণ্ডা যা দেখছিলো, তা-ই তার কাছে ভালো লাগছিলো। চাচা এবং চাচীর কথা মনে পড়ছে বারবার। বিদায় নেবার সময় ওঁদের দু'জনকেই খুব বিষন্ন লেগেছিলো। অবশ্য লিণ্ডার মনটাও ছিলো বেদনাচ্ছন্ন। গাড়িটা ছুটছে। রাস্তার দু'ধারে গ্রাম। ক্ষেত খামার। চাষীরা কাজ করতে করতে মুখ তুলে গাড়ি দেখছে। গাড়ির চাকাগুলো তীব্র বেগে ঘুরছে। আর প্রতিটি ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে লিণ্ডা ক্রমশ কাছাকাছি হচ্ছে ডন রামোসের। ডন রামোস—! অত্যন্ত সুদর্শন এই লাতিন যুবকের সঙ্গে এটা হবে তার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। এমন সুপুরুষ খুব কমই চোখে পড়ে। ভাবলো লিণ্ডা। মেয়েদের কাছ থেকে প্রশংসাটা যেন ডন রামোসের প্রাপ্য। ডন রামোসের সুন্দর মুখ আর উষ্ণ হাতের ছোঁয়ার কথা মনে পড়তেই সারা শরীর রোমাঞ্চিত হলো লিণ্ডার। খুবই সামান্য, খুবই ক্ষনিক ছিলো সেই স্পর্শ। কিন্তু সুগঠিত আঙুলে পরা পুরু সোনার আংটিটার ছোঁয়া সে যেন এখনও অনুভব করতে পারছে।

ম্লান হাসি ফুটে উঠলো লিণ্ডার ঠোঁটে। কী অসম্ভব চিন্তা তার। কী অলীক কল্পনা। আকাশ কুসুম কি একেই বলে? ভাবলো সে। ডন রামোস বিবাহিত কি অবিবাহিত—জানেনা লিণ্ডা। যাই হোক না কেন—স্প্যানিশ মিয়েরার মতোই সে তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু মন থেকে ডন সরছে কোথায়? এক সময় সিনেমা দেখতে গিয়েও এরকম হয়েছে লিণ্ডার। প্রেক্ষাগৃহের রহস্যময় পর্দায় প্রিয় নায়কের মুখ দেখেও বুকের ভেতর তুফান উঠেছে। কিন্তু তারা তো ছিলো কল্পলোকের নায়ক। ছায়াছবির নায়কেরা আর যাই হোক, সত্যিকার নায়কদের ধারে কাছেও দাঁড়াতে পারেনা। রক্তমাংসের সজীব পুরুষই তো পারে রমনী হৃদয় রক্তাক্ত করতে।

'লা গ্রাঞ্জা ভিসতা' নামের বাড়িটি আর বেশী দূরে নয়। গাড়ি যতোই এগোচ্ছে, ততোই বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যাচ্ছে লিণ্ডার। মনের মধ্যে তোলপাড় করছে নানা কথা। কতো স্বপ্ন দেখেছিলো সে এই দেশটির। কতো কল্পনা। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না প্রথম দিকে। অথচ আজ, এ মুহূর্তে সে এসে পৌঁছেছে সেই স্বপ্নপুরীর দোর গোড়ায়। গাড়িটা একটা বাঁক নিতে যাচ্ছিলো। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ড্রাইভারটা। দু'চোখ বিস্ফারিত করে পেছন ফিরে তাকালো সে। লিণ্ডা কোনো-কিছু বুঝবার আগেই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। বিকট শব্দ করে

শক্ত কিছুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে গেলো গাড়িটা। কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে গাড়ির মুখটা ত্বরিৎ ঘুরিয়ে দিলো সুদক্ষ চালক। এক বিপদ থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে আবার অন্য বিপদ। নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেললো ড্রাইভার। আরো একটা মারাত্মক ঝাঁকুনি। কাৎ হয়ে পড়লো গাড়িটা। সামনের আসনের পেছন দিকে সজোরে ঠুকে গেলো লিণ্ডার মাথাটা। পর মুহূর্তে নিজের সীটের পেছন দিকে বাড়ি খেলো তার মাথা। সঙ্গে সঙ্গে ঝাপ্‌সা হয়ে এলো চোখের দৃষ্টি। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো লিণ্ডা।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়। রাস্তার ঠিক মাঝখানে পড়ে ছিলো একটা সব্‌জী ঝুড়ি। খুব সম্ভব চলন্ত কোনো ট্রাক থেকে অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়ে থাকবে। সেই ঝুড়িটাকে পাশ কাটাতে গিয়েই বিপত্তি। কেবল বিপত্তি বললেই ভুল হবে। বরং বলা উচিত— প্রাণান্তকর পরিস্থিতি। গাড়িটা একপাশে কাৎ হয়ে কয়েকখণ্ড পাথরের ওপর এমনভাবে আট্‌কে আছে যে, সামান্য একটু সরে গেলেই তা আরোহী-সুদ্ধ নিমজ্জিত হবে সমুদ্র-গর্ভে। লিণ্ডা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে ব্যাক সীটে। ড্রাইভার বিড়বিড় করে স্মরণ করছে সৃষ্টিকর্তাকে। এমন কি কখন যে একটা বিশাল লিমুজিন এসে কাছাকাছি থেমেছে এবং দুর্ঘটনায় পড়া গাড়িটাকে দু'জন মানুষ শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে— তাও সে জানেনা। সে তখনো বউ ছেলেমেয়ে, মা-বাবা আর

ভাইপো -ভাইঝির দোহাই দিয়ে জান ভিক্ষা চাইছে খোদার কাছে।

লিমুজিনের এঞ্জিনটা চালু রয়েছে তখনো। ক্যাবের পেছনকার অ্যাক্সেলের সঙ্গে শক্ত করে দড়িটা বাঁধা। দড়ির এ প্রান্ত— বলাই বাহুল্য লিমুজিনের সঙ্গে আটকে ফেলা হয়েছে ত্রস্ত হাতে। আরোহী গুরুগম্ভীর গলায় ক্যাব-ড্রাইভারকে সতর্ক থাকতে বলে পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। কনিয়াকের ফ্লাস্ক খুলে কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিলো অচেতন মেয়েটির মুখের মধ্যে। খুব দুর্বলভাবে মুখটা নাড়ালো লিণ্ডা। আস্তে আস্তে ঢোঁক গিললো। তারপর ক্লান্তভাবে ঠোঁট নেড়ে সরিয়ে দিতে চাইলো ফ্লাস্কের মুখটা।

'আর একটু, আর সামান্য একটুখানি!' কথা ক'টি কানে যাবার পর মুহূর্তে খানিকটা নড়ে চড়ে উঠলো লিণ্ডা। তারপর আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে জেগে উঠলো এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় পুরুষের শরীর। বেশ বাদামি, সুগঠিত মুখ। উজ্জ্বল চোখ। এক পলক দেখলেই বোঝা যায়, এই মানুষটি স্থায়ীভাবে বসবাস করে আবহমান রৌদ্রের নীচে। সহসা পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বিস্ময়ের শিহরণ বয়ে যায় লিণ্ডার। মানুষটাকে তার পরিচিত মনে হচ্ছে কেন? মনে হয়, অনেক দিনের চেনা। অনেক দিন আগে কোথায় যেন সে দেখেছিলো এই লোকটাকে। কিন্তু মাথার ভিতরে এ মুহূর্তে তার

এমন একটা যন্ত্রনা হচ্ছে, যে কিছুতেই মানুষটার নাম স্মরনে আনতে পারছে না। তাই তো— কী নাম লোকটার? আর লিণ্ডাই বা কীভাবে তার বাহুবন্দিনী হলো। এমন প্রশস্ত আর আরামদায়ক আসনই বা কোন্ গাড়িটির। আহ্— যেন হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে ওরা।

'আপনি খুব কঠিন আঘাত পেয়েছেন সিনোরিটা। ক্যাস্টিলোতে পৌঁছে এক্ষুণি আপনার বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

:বিশ্রাম। লিণ্ডার মাথার ভিতর চিন্ চিন্ করে উঠলো একটা ব্যাথা। অস্পষ্ট গলায় সে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো, 'আমি এখানে কেন?'

'শিগগীরই সবকিছু মনে পড়বে আপনার।' লোকটা আশ্বস্ত করতে চাইলো ওকে। তারপর কনিয়াকের ফ্লাস্কটা বাড়িয়ে ধরলো সামনের আসনে বসা কোনো লোকের দিকে। বললো, 'তুমিও খানিকটা খাও হে! তোমার আঘাতটাও কম নয়।'

'ঠিক বলেছেন সেনর। ভাগ্যিস, আপনি এসে পড়েছিলেন। নইলে ওই ইংরেজ মেয়েটি আর আমি নির্ঘাৎ এতোক্ষণে সমুদ্রের তলায়। এবং আমার পরিব গাড়িটাও সেই সঙ্গে।'

'আর কোনো ভয় নেই। এখন তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।' সুগভীর এক আন্তরিকতা ছিলো সেই শান্ত সহজ কণ্ঠস্বরে। লিণ্ডার কাছে যা মনে হলো খুব অন্তরঙ্গ— বড়ো আপন।

দুর্ঘটনার ছবিটা মনে এলেও— বারবার তা ছিন্নভিন্ন হয়ে

যাচ্ছে। সেই ছেঁড়া ছেঁড়া ছবিগুলোকে প্রাণপণে জোড়া দেবার চেষ্টা করতে করতে লিণ্ডা বললো—

'ঘটনাটা কীভাবে ঘটলো যেন ?··· ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে।··· গাড়িটা যেন কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেলো।' ক্লান্তি স্বরে কথা-ক'টি উচ্চারণ করে সে।

'মনে পড়ে গেছে—তাই না!'

নিজের মুখের ওপরে প্রায় ঝুঁকে পড়া, শক্ত গড়নের শ্যামবর্ণ মুখটার দিকে তাকালো লিণ্ডা। আশ্চর্য অনুভূতিটা আবার যেন ফিরে আসছে আস্তে আস্তে। লোকটাকে এতো পরিচিত মনে হচ্ছে কেন? এতো আপন? কিন্তু এই মানুষটিকে তো এর আগে সে আর কখনো দ্যাখেনি। কে এই লোকটা? ওর মনের কথা যেন পড়ে ফেলেছে মানুষটা। জবাবে তাই বলে উঠলো, 'আমার নাম করিম আল খালিদ—দে তোরেস। তা, আপনার নামটা কি এখন মনে করতে পারছেন সিনোরিটা!'

'হ্যাঁ— আমার নাম লিণ্ডা লেনী।' কথা'কটি বলেই লোকটার দিকে প্রায় বিস্ফারিত চোখে তাকালো সে। বিদ্যুচ্চমকের মতোই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো একখানা মুখ। মুখটা ডন রামোসের। রয়েল হোটেলে যে লোকটা তার ইন্টারভিউ নেয়— তার নাম ডন রামোস গিল দ্য তোরেস। হুবহু এই মুখ। তাহলে দু'জনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো সম্পর্ক আছে। ভাবলো লিণ্ডা। অনুচ্চ স্বরে উচ্চা-

রণ করলো, 'আমি, আমি যাচ্ছিলাম লা গ্রাঞ্জা ভিসতার দিকে।' স্বাভাবিক হয়ে ওঠার জানান দিয়ে আসলে মানুষটার বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চাইলো লিণ্ডা। অনুভব করলো— কী সুগঠিত এই হাত দু'টো। যেন বাদামী চামড়ার দস্তানা পরে আছে।

'এখন একটু সুস্থ মনে হচ্ছে কি?' লোকটা জিজ্ঞেস করলো। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো লিণ্ডা। বললো, 'গাড়িটার কি অবস্থা হয়েছে বলতে পারেন?'

'ওটা এখন খাদের মধ্যে। আপনিও প্রায় সেখানেই যেতে বসেছিলেন। চরম মুহূর্তে আমি এসে পড়ি এই দিকটায়। অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা করি গাড়িটাকে। সেইসঙ্গে আপনাদেরকেও। তা-ও ভালো, আজ ড্রাইভার নিয়ে বেরিয়েছিলাম।'

শিউরে উঠলো লিণ্ডার সারা শরীর। গাড়িটার হুমড়ি খেয়ে পড়ার শব্দটা এখনো যেন তার কানে বাজছে।

'তাহলে, আপনিই আমাদের বাঁচিয়েছেন সেনর?'

'মনে হচ্ছে তা-ই ই।'

'কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো।'

'ধন্যবাদের জন্যে ধন্যবাদ। তবে এর চেয়েও অনেক বড়ো জিনিস আমি পেয়ে গেছি। আমার পিতৃভূমিতে একটা প্রবাদ আছে যে একটা জীবনও যদি তুমি রক্ষা করতে পারো তাহলে বেহেশতের দরজাটা তোমার জন্যে খোলা থাকবে।'

কিন্তু প্রবাদের কতোটুকু তার কানে গেছে বলা মুশকিল। কেননা করিম যখন কথা বলছে— লিণ্ডা তখন সম্পূর্ণ আনমনা হয়ে তাকিয়ে আছে পুরু ভুরুর নিচের দিককার প্রাচ্যদেশীয় চোখের দিকে। দু'জনের চোখাচোখি হতেই লিণ্ডা নড়ে উঠলো। আর তার পিঠের নিচ থেকে হাত দু'টো সরিয়ে নিলো আল খালিদ। আস্তে আস্তে উঠে বসলো লিণ্ডা। আলতোভাবে হেলান দিয়ে বসলো বিশাল গাড়িটার আরামদায়ক সীটে।

'সেনোরা ভালকারেল নোভালিস কি আপনার কিছু হন?' জিজ্ঞেস করলো লিণ্ডা।

'আমার চাচাতো বোন।' জবাব দিল করিম, 'ও, আপনিই তাহলে আমার ভগ্নীর কল্যানেরা হিসেবে কাজে যোগ দিতে এসেছেন? কী ঠিক বলিনি সিনোরিটা লেনী?'

'হ্যাঁ, কিন্তু অদ্ভুত যোগাযোগ দেখুন। কী বিচিত্র অবস্থার মধ্যে আমাদের দেখা হয়ে গেলো। সৌভাগ্যই বলতে হয়, যে আপনি ওই সময়টিতেই বেড়াতে বেরিয়েছিলেন।'

'যা বলেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা সৌভাগ্যজনক না দুর্ভাগ্যজনক কে জানে!'

এর কোনোটাই নয়। মনে মনে ভাবলো লিণ্ডা। যুৎসই শব্দ খুঁজতে লাগলো। পেয়েও গেলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। কিসমৎ বলে আরবীতে একটা শব্দ আছে। তার মানে হলো এক্ষেত্রে এই শব্দটিই সব চেয়ে বেশি অর্থবহ। সে জিজ্ঞেস

করলো। 'ফেরার পথে কি একবার আপনার বোনের সঙ্গে দেখা করে যাবেন।'

'ঠিক তা নয়।' ইষৎ হেসে আস্তে আস্তে বললো করিম, 'গ্রাঞ্জা সম্পর্কে আপনার বোধ হয় খুব একটা পরিস্কার ধারনা নেই। তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন।' জবাব দিলো লিণ্ডা। তার মনের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে বিস্ময়। জেগে ওঠে প্রশ্ন। মনে মনে সে ভাবে—কে জানে। আরো কোন নতুন চমক অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

'গ্রাঞ্জাটা হলো' করিম ব্যাখ্যা করতে থাকে, 'আসলে একটা বসতবাড়ি। আর সেই বাড়িতে তার বাচ্চাটিকে নিয়ে বসবাস করে দোনা দোমায়া। লাতিন আমেরিকার গণ্ডগোলে তার স্বামীকে সৈন্যরা পাকড়াও করে নিয়ে যায়। আরো অনেকের মতে সেও আর ফিরে আসেনি। অথচ লুইস--মানে দোমায়ার স্বামী ছিলো ওদেশের খুব সম্মানিত ডাক্তার। এই, আজকে যেমন আপনার জন্যে খানিকটা করেছি—কিছুটা এইভাবে কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে ওকে রক্ষা করি। তারপর থেকে সে আমার এস্টেটেই থাকছে। আপনিও ওখানেই থাকবেন সিনোরিটা। অর্থাৎ একজন বৃটিশ সঙ্গিনী গান শেখাবে পেপিতাকে। সেই সঙ্গে খানিকটা ইংরেজিও।'

'ও--হ্যাঁ।' খানিকটা আমতা আমতা করে থেমে গেলো

লিণ্ডা। চাকরির ইন্টারভিউ নেবার সময় ডন রামোস তাকে এসব কথার একটাও বলেনি। পোপিতা কিংবা তার মাকে যে একটা ভয়াবহ অবস্থা থেকে রক্ষা করা হয়েছে—তার বিন্দুবিসর্গ বলা হয়নি তাকে। কিন্তু খবরের কাগজে তো দেখেছে সে। রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থান যেন লেগেই আছে কোনো কোনো লাতিন মুল্লুকে। আর সেই অভ্যুত্থানের রূপ যে কি ভয়ঙ্কর, তা কে না জানে!

পেছনের সাটে হেলান দিয়ে দু চোখ মুঁছলো লিণ্ডা। ডন রামোসের কথা মনে পড়ছে। লণ্ডনে তার ইন্টারভিউয়ের আগে চাচী ডোরিসকে সে আশ্বস্ত করে বলেছিলো, তার যোগ্যতা সে যদি প্রমাণ করতে পারে—তবেই সে নেবে এই চাকরিটা। তার সব কাজেই বাগড়া দেয় সবাই। যা কিছু করতে চায়—বাধা আসে সঙ্গে সঙ্গে। কোনো স্বাধীনতা নেই। এবার চাচীকে সে সাফ সাফ বলে দিয়েছে, তার বয়েস এই তেইশ। এখন সে ইচ্ছে করলে দূরের কোনো যায়গা-তেও যেতে পারে। লিণ্ডা আসলে একটু মুক্ত বাতাস খুঁজছিলো। কিন্তু চাচী চাইছিলেন তার পায়ে শেকল পরাতে। পারিবারিক বন্ধুপুত্র ল্যারি নেভিন্‌সের সঙ্গে ধরে বেঁধে বিয়ে দেবার জন্যে কিছুদিন থেকে একরম মরিয়া হয়ে উঠেছেন, চাচা চাচী উভয়েই।

ছেলে বেলা থেকে সে চাচা চাচীর কাছেই মানুষ। ও যখন

ছোট্টটি--সেই সময় মা-বাবার বিয়ে ভেঙ্গে যায়। চাচা গান পাগল মানুষ। ভাইঝিকে গান শেখার জন্যে ভর্তি করে দিয়েছিলেন লণ্ডনের কলেজ অব মিউজিকে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে লিণ্ডা। পেয়েছে স্কলারশিপ। নামকরা এক অর্কেষ্ট্রা থেকে অফার এসেছিলো। তাকে সেখানে চেলো বাজাতে হবে। কিন্তু মন টানেনি তাতে একটা খুব। বরং পত্রিকার আবশ্যক কলামে একটি পছন্দ মতো চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে সোজা পাঠিয়ে দিয়েছিলো দরখাস্ত। পত্রিকার নাম 'দ্য লেডি'। চাচা এটির গ্রাহক। দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবার কয়েক দিনের মধ্যে এলো জবাব। আগামী তিরিশ তারিখ শুক্রবার ইণ্টারভিউ।

শুক্রবারে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছালো লিণ্ডা একটা ক্যাবে চড়ে। মে ফেয়ারের রয়েল হোটেলে ঢুকতে বুকের ভেতরটা গুড় গুড় করে উঠলো তার। সুইং ডোরের সামনেই ধড়াচুড়া পরা ডোরম্যান। লোকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো লিণ্ডাকে। হালকা সোনালী চুলের নিচে চমৎকার এক জোড়া চোখ। টিকোলো নাক। মুখটা তো তার যে দেখে, তারই ভালো লাগে। ডোরম্যানেরও লাগলো। সে সমীহ করে সুইং ডোরের পাল্লাটা খুলে ধরলো। হোটেলের ফয়ারে পুরু কার্পেটে পোটা মেঝেটা ঢাকা। লিণ্ডা এমন স্বাভাবিক-ভাবে সেখানে ঢুকলো, যাতে মনে হয়, সে প্রায়ই এখানে আসে। ডেস্কে বসা লোকটা তার দিকে তাকালো জিজ্ঞাসু

দৃষ্টিতে।

'আমার নাম লিণ্ডা লেনী। এসেছি সেনোরা ভালকারেল নোভালিসের কাছে।' সে বললো, 'তিনটের সময় তার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা।'

ডেস্কে বসা যুবকটি প্রথমে কব্জি তুলে ঘড়ি দেখালো। তারপর তুলে নিলো টেলিফোন। অপারেটরের কাছে একটি বিশেষ কক্ষের নম্বর চাইলো। তারপর নাম বললো লিণ্ডার।

'মিস লেনী?' সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ বাঁকা করে তার দিকে তাকালো যুবক। তার কণ্ঠস্বরে সম্ভ্রম। 'আপনি একটু অপেক্ষা করুণ। কেউ একজন এক্ষণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।'

'ধন্যবাদ!' পুরু গদিঅলা একটি কৌচের ওপর বসলো লিণ্ডা। তার সামনে ঘোলাটে কাচে ঢাকা ছোট টেবিল। মনে হলো এই প্রথম তার পা দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। যেমন কাঁপতো কালজের গানের পরীক্ষায়। কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় এসেছে সে। এবং এক্ষুণি যে তার ইন্টারভিউ নেয়া হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কোথায় কি, আধঘণ্টা পেরিয়ে গেলো তিনটে বাজবার পর। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দেখা নেই। দমে গেলো লিণ্ডা। তবে কি সে বৃথাই এসেছে? সেনেরা কি তাঁদের পছন্দোসই লোক আগেই নিয়ে ফেলেছেন, হতাশ লাগছে ওর। মনের পটে স্পেন দেশের যে উজ্জ্বল ছবিটা এঁকে-

ছিলো, তা যেন কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। নিজের বোকামির জন্যে মনে মনে খুব রাগ হলো লিণ্ডার। নিজেকে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে কেন ভেবে নিয়েছিলো সে, এভাবে নানা কথা ভাবছে—হঠাৎ রিসেপশন ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়ালো একটা লোক। দৃঢ়, প্রত্যয়ী চেহারা। এক কথায় চোখে পড়ার মতো। ভদ্রলোক ডেস্কে বসা যুবককে কিছু জিজ্ঞেস করেতেই যুবক আঙুল তুলে লিণ্ডাকে দেখালো।

লিণ্ডা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে—ভদ্রলোক আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালেন কৌচের কাছে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা। পরনের দামী স্যুটটা ভাঁজে ভাঁজে মিলে গেছে তাঁর শরীরের সঙ্গে। হাল আমলের একজন ম্যাটাডরের ভঙ্গীতে তিনি লিণ্ডার কাছে এসে দাঁড়ালেন। লিণ্ডার চোখে তবু পলক পড়ে না।

'আপনিই সিনোরিনা লেনী ?'

'হ্যাঁ--হ্যাঁ।' জবাবের সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াতে গেলো কিন্তু হাত ব্যাগটা পড়ে গেলো কার্পেটের ওপর। আর ব্যাগখানা সে উচু হয়ে কুড়িয়ে নেবার আগেই দেখলো--ভদ্রলোকের হাতে সেটি দোল খাচ্ছে।

'নার্ভাস হবেন না!' ইংরেজিতেই বললেন ভদ্রলোক। তবে লাতিন টানটা স্পষ্ট খেয়াল করতে পারলো লিণ্ডা। ব্যাগটা লিণ্ডাকে ফিরিয়ে দিয়ে তার পাশের কৌচে আস্তে আস্তে বসলেন তিনি। 'আমার বোনের শরীরটা ভালো নয়।

তাই তার বদলে আমিই ইন্টারভিউ নিতে এসেছি। আমার নাম ডন রামোস। ডন রামোস গিল দ্য টোরেস। আর আপনিও নিশ্চয়ই এসেক্সের সেই ইংরেজ যুবতী—দোমায়ার কাছে যিনি অত্যন্ত আবেগময় চিঠি লিখেছিলেন?'

লিণ্ডা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

ভদ্রলোক বললেন, 'চিঠিতে আপনি লিখেছিলেন, কম্প্যানেরা বা সঙ্গিনী হবার ব্যাপারে আপনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তা, হঠাৎ এধরনের পেশায় আসার ইচ্ছে হলো কেন, জানতে পারি কি?'

লিণ্ডার দৃষ্টি তখনো আটকে আছে অমন সুন্দর মুখখানার ওপর। সে অনেকটা আত্মগতভাবে বললো, 'পেশাটা খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে আমার কাছে। একবার তাই চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'তাহলে সিনোরিটা, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আপনার চিঠি পড়ে আমার বোন অভিভূত হয়েছেন। উনি আমাকে জানাতে বলেছেন, আপনি ইচ্ছে করলেই চাকরিটি গ্রহণ করতে পারেন। সিদ্ধান্ত নেবো আমি, অবশ্য বোনের নির্দেশেই।'

উদ্‌গত উত্তেজনা অতিকষ্টে দমন করলো লিণ্ডা। গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বললো, 'তা আপনার সিদ্ধান্তটা জানতে পারি কি সেনর?'

'আপনি চমৎকার কথা বলতে পারেন, পোশাক আশাকে

অত্যন্ত পরিপাটি।' ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার নখগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার। মেয়ের সঙ্গিনী হবার ব্যাপারে কোন্ সচেতন মা এর থেকে ভালো প্রার্থী খুঁজবেন বলুন দেখি।'

'তাহলে আমি নির্বাচিতা? -- কী বলেন সেনর?' ভেতরের আবেগ যেন কিছুতেই আর চেপে রাখতে পারছে না লিণ্ডা।

'আপনি চাকরিটা পেয়ে গেছেন সেনোরিটা।'

'কাজকর্ম কখন, কবে থেকে শুরু করবো, জানতে পারি সেনর?'

'ব্যস্ততার কিছু নেই। কফি খেতে খেতে সব কিছুই আমি বুঝিয়ে বলবো আপনাকে।' কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। তারপর হাত ধরে লিণ্ডাকে উঠতে সাহায্য করে বললেন, 'চলুন, লাউঞ্জে যাওয়া যাক। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওয়া কফি দেবে।'

ঘণ্টা খানেক পর রয়েল হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো লিণ্ডা। বেলা পড়ে আসছে। এসেক্সের ট্রেনে চেপে বসলো সে। ট্রেন ছেড়ে দিলো। আনন্দে ভরে গেছে লিণ্ডার প্রাণ। ট্রেনের চাকার আওয়াজ তার কানে এলো অন্য-ভাবে, অন্য ছন্দে। শব্দটা যেন এরকম

—লিণ্ডা লেনী লিণ্ডা লেন
যাচ্ছো দূরে যাচ্ছো স্পেন
যাচ্ছো স্পেন যাচ্ছো স্পেন

থাকচ্ছে পড়ে অন্ধ লেন্
লিণ্ডা লেনী লিণ্ডা লেন···

হ্যাঁ, সে স্পেনেই যাবে এবার। সেই স্পেন, যেখানে ডন রামোসের সঙ্গে তার আবার দেখা হবে। ডন রামোস, নামটাকে মগজ থেকে কিছুতেই সরাতে পারছেনা লিণ্ডা। মগজ থেকে নামটা যেন হৃদয়ের দিকে যেতে চাইছে বারবার। সত্যি, দীর্ঘশ্বাসের সংগে সংগে লিণ্ডা ভাবলো, এক এক একজন পুরুষ থাকে, মেয়েদের বুকের গভীরে ক্ষত সৃষ্টির ব্যাপারে যাদের জুড়ি মেলা ভার।

চোখ বুঁজে এলোমেলো নানাকথা ভাবছিলো লিণ্ডা। হঠাৎ তাকায়। আর তাকিয়ে দ্যাখে পাশেই বসে আছে তার রক্ষাকর্তা। একটু আগে যিনি তাকে মারাত্মক একটি দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়েছেন। দামী এবং শৌখিন লিমুজিনের পেছনের সীটে হেলান দিয়ে বসে ক'দিন আগের কথাই মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলো সে। এ মুহূর্তে আবিস্কার করলো, ট্রেনের কামরায় নয় সে বসে আছে করিম আল খালিদের গাড়ির ভেতরে। অনেকটা একই রকম চেহারা। কিন্তু ভিন্নতাও রয়েছে। করিমও অত্যন্ত সুপুরুষ। দারুন রূপবান মানুষ। সুবেশ এবং শৌখিন তো অবশ্যই। তবে চেহারায় আরব-আরব ভাবটাই বেশি। কালো চোখের মনি। ঘন ভ্রূ। সুগঠিত মুখখানায় লাবন্যের পাশাপাশি এক ধরনের কাঠিন্যও যেন নজর এড়ায় না। মনে হয়, প্রভুত্ব করার

জন্যেই পৃথিবীতে এ মানুষটির জন্ম হয়েছে। ডন রামোসের সঙ্গে তার সাদৃশ্যটা চোখ এড়িয়ে যাবার নয়। কিন্তু এই মানুষটা যেন আরো একটু গম্ভীর, আরো একটু রাশভারি।

'কম্প্যানেয়ার হবার পক্ষে বয়েসটা বেশ অল্প মনে হচ্ছে।' সহসা বলে ওঠে করিম, 'আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার কম্প্যানেয়ার ছিলো একটা বুড়ী। সময় অনেক পাল্টেছে দেখতে পাচ্ছি।'

'যা বলেছেন।' জবাব দিলো লিণ্ডা। যদিও মানুষটা সম্পর্কে সে খুব বেশি কিছু জানেনা। বরং যাকে দেখলেই রোদেপোড়া মরুভূমিতে একটা কালো তাবুর ছবি মনে আসে। যেন আলখাল্লা খুলে রেখে হাল-ফ্যাশানের স্যুট পরেছে মানুষটা। যেন একটু আগেই তার পরনে ছিলো ভারী বুট। কয়েক ঘণ্টা আগেও তো সবুজ মায়া ভরা সুন্দর স্বদেশে ছিলো লিণ্ডা। আর এখন? এখন সে এমন একটি দেশে, যেখানে মরমিয়া সাধকরা সাধনার নামে চর্চা করে নিষ্ঠুরতার। যেখানে স্বামীদের কাছে মেয়েদের পরিচিতি অনেকটা দাসীর মতোই।

অবচেতনভাবেই মানুষটাকে তার কাছে কেমন অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, ওর পাশ থেকে যতোটা দূরে সরে বসা যায়, ততো ভালো। একটু আগেই অবশ্য লোকটা তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু ওর ভাবলেশহীন মুখের রেখায় কি কোনো কিছুই লেখা নেই? লোকটা কি কোনো

প্রতিদানই আশা করছে না ?

'এই তো, আর মিনিট কয়েক মাত্র,' কালো ব্যাণ্ড বাঁধা সোনার ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে করিম বললো, 'অল্প সময়ের ভেতরেই আমরা পৌঁছে যাবো ক্যাস্টিলোর গেটে। নানা রকম অভাবিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে আপনাকে, অল্প সময়ের ব্যবধানে, তাই না সিনোরিটা ? সে যাই হোক, আমার চাচাতো ভাই ডন রামোসের মুখে এখানকার বিবরণ নিশ্চয়ই সব শুনেছেন, সেই রকমই একটা আরামদায়ক ভবন এখন আমাদের সামনে।'

কথা বলতে বলতে অনেকখানি সে ঝুঁকে এসেছে লিণ্ডার দিকে। এতোটা কাছে যে কড়া তামাক এবং তীব্রগন্ধী সাবানের ঘ্রাণ পাচ্ছে এখন লিণ্ডা। এর গায়ের রং যদিও অনুজ্জ্বল, ত্বকটা খুবই মসৃণ। দাঁতগুলো ঠিক মুক্তোর মতো ঝকঝকে।

'ডন আমার কথা একটিবারও আপনাকে বলেনি ? কী ? বলেছে বুঝি !' জিজ্ঞেস করলো করিম।

বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফ দিয়ে উঠলো লিণ্ডার। শরীরটা ব্যথায় মুচড়ে উঠছে বারবার। বেদনাকাতর গলায় সে অস্পষ্টভাবে কিছু বললো। মাথা নাড়লো আস্তে আস্তে।

'স্পেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।' বললো করিম, 'আশা করি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কিংবা দুর্ভাগ্যজনক ওই ক্যাব-দুর্ঘটনার জন্যে দেশটাকে দায়ী করবেন না।'

'মোটেই না।' বললো লিণ্ডা। 'যদিও আমার ব্যাগ-বাক্স সব হারিয়েছি, তবুও না।'

'লাগেজ খুইয়ে ফেললে কোনো মহিলারই আনন্দিত হবার কথা নয়। আপনিও নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে পড়েছেন। ভাবছেন স্পেনের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে টুথব্রাশ, লিপস্টিক কিংবা পোশাক আশাক কোথায় পাবেন। কী? ভাবছেন না?'

'হ্যাঁ।' ক্ষীণকণ্ঠে স্বীকার করলো লিণ্ডা। তার কতো কষ্টের, কতো পরিশ্রমের ফসল ওই জিনিসগুলো। কতোদিনের সঞ্চয় ভাঙ্গিয়ে এখানে আসবার আগে সে পোশাক আশাক বানিয়েছিলো। দক্ষিণাঞ্চলীয় আবহাওয়ার উপযোগী করে তৈরী হয়েছিলো সেসব। টুকিটাকি আরো কতো দরকারী জিনিস ছিলো ব্যাগ আর ট্রাঙ্কে। সব গেছে। চোখে পানি এসে যাবে যেন লিণ্ডার। তবে কি চাচীর কথাই ঠিক? তিনি তো লিণ্ডার স্পেনে আসবার ব্যাপারে একটুও রাজি ছিলেন না। বরং বারবার বলতেন, 'জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল করতে যাচ্ছো তুমি।' শেষ পর্যন্ত তার কথাই কি সত্য হতে চলেছে? ডোরিস চাচীর গলার আওয়াজ যেন স্পষ্ট কানে আসছে লিণ্ডার, 'আমার এই কথাগুলো লিখে রাখো, বুঝলে লিণ্ডা। লেখো, ওই বর্বরদের দেশ থেকে তোমাকে দৌড়ে পালিয়ে আসতে হবে। যে রোমানরা খৃষ্টান পেলেই তাকে ফেলে দিতো সিংহের মুখে, ওরা সেই রোমানদের চাইতে একটুও উন্নত নয়।'

'আপনি ক'াদছেন।' একটা শক্ত থাবা নেমে এলো লিণ্ডার গালের ওপর। পরম যত্নে চোখের পানিটুকু মুছিয়ে দিতে দিতে করিম বললো, 'ওই ক'টা তুচ্ছ জিনিসের জন্যে কেউ ক'াদে নাকি! অ'্যা! যা গেছে তা আবার আসবে। কী, ঠিক বলিনি?'

'আপনি ব্যাপারটা যতো সহজ ভাবছেন, আমার কাছে তা ততোটা নয়। ক্ষতিটা আমার মতো একটা মেয়ের জন্যে প্রায় অপূরনীয়।'

'বলেন কি?'

ডন রামোসও একদা তাকে রোমাঞ্চিত করেছিলো। কিন্তু এই লোকটি অন্যরকম। রোমাঞ্চিত করছে সেও। কিন্তু অন্যভাবে। কেমন করে, কিছুটা যেন ভয় ধরানো রোমাঞ্চ এটা।

'আপনি বাস করেন প্রাসাদে। দুর্লভ গাড়িতে ঘুরে বেড়ান।' লিণ্ডা আস্তে আস্তে বললো, 'সাধের সঞ্চয় ভাঙ্গিয়ে যে জিনিসগুলো কেনা হয়েছিলো, তা অমন ভাবে নষ্ট হলে একটি গরিব মেয়ের কেমন লাগে, সে কথা আপনাকে বোঝানো যাবেনা। খুব সম্ভব, চাকরির টাকায় যাদের বেঁচে থাকতে হয়, তাদের সম্পর্কে আপনার কোনো ধারনাই নেই। আপনার পরনের স্যুটটার যে দাম, তার অর্ধেকেরও কম টাকায় অবশ্য কেনা হয়েছিলো আমার সবগুলো জিনিস।'

আমি মেনে নিচ্ছি আপনার কথা, 'সিনোরিটা।' বলতে

বলতে সরে বসলো করিম। তার ছায়াছন্ন মুখ আর চোয়ালের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন এক ধরনের নিষ্ঠুরতার সন্ধান পেলো লিণ্ডা। করিম আবার বলে উঠলো, 'যা যা আপনি হারিয়েছেন তার সবকিছুই পেয়ে যাবেন। আমি আপনাকে সে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমি যদ্দুর জানি, শিগগীরই একবার সান লোপেজে যাবে দোনা দোমায়। তখন আপনার খোয়া যাওয়া সবকিছুই সে কিনে আনতে পারবে। আর হ্যাঁ, এ মুহূর্তেও আপনার বিব্রত হবার দরকার নেই। লাতিন আমেরিকায় সামরিক অভ্যুত্থানের বাড়াবাড়ির সময় আমার বাড়িটা পরিণত হয় একটা রিফ্যুজি ক্যাম্পে। দলে দলে শরণার্থী এসে আশ্রয় নিচ্ছে ক্যাস্টিলোয়। স্রেফ প্রাণটুকু হাতে নিয়েই তারা এসেছে। সঙ্গে আর কিছুই নেই। ওদের জন্যেই সব ধরণের পোশাক আশাক যোগাড় করে রাখতে হতো আমাকে। মনে হয়, সেই বস্ত্র ভাণ্ডারে এখনো যা অবশিষ্ট আছে, তা দিয়ে অ্যাডোরেকশন আপনার চাহিদা মেটাতে পারবে।'

'ধন্যবাদ সেনর।' লিণ্ডা অনুভব করলো, আস্তে আস্তে তার দায়িত্বভারটা যেন করিমের ওপরই অর্পিত হয়ে যাচ্ছে। সে অলস মস্তিস্কে চিন্তা করলো, আচ্ছা, ওই অ্যাডোরেকশন কে? কোনো স্প্যানীশ মহিলার নাম, বোঝাই যায়। কী চমৎকার নামটা, তাই না? কিন্তু কে এই রমনী? সে কি করিম আল খালিদের স্ত্রী! আড়চোখে চেয়ে চেয়ে করিমকে যেন

অরিপ করে লিণ্ডা। যতোটা স্পনীয়, তার চাইতে অনেক বেশি আরব্য এ চেহারা! তবুও আরবের মাটিতে জীবন যাপন না-করে-সে চলে এসেছে স্পেনদেশে। এক পলক দেখেই আঁচ করা যায়, প্রচণ্ডরকম সম্পদশালী। নইলে আগের দিনের সামন্ত প্রভুদের মতো শরনার্থী-সেবায় দুর্গের দুয়ার অমন খুলে দিতে পারে কেউ?

সাহসীও মনে হচ্ছে মানুষটাকে। খুব সম্ভব বহু বিপদের মোকাবেলা করেছে জীবনে। সাংঘাতিক চরম ঝুঁকি নিতে যে পেছ পা হয় না তার প্রমান তো সে নিজেই পেয়েছে একটু আগে। সত্যি বলতে কি, অন্যকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেকে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করাতে খুব অল্প লোকই পারে। এ লোকটি তা পেরেছে। বিধ্বস্ত ক্যাবটা যখন আহত আরোহী সুদ্ধ একটু একটু করে খাদের দিকে এগোচ্ছে, সে মুহূর্তে গাড়ির পেছনের সীট থেকে আলগোছে একজন মহিলাকে বের করে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। ড্রাইভারটা অবশ্য নিজেই বেরিয়ে এসেছিলো। নইলে এ লোকটা আরো একবার ঝুঁকি নিতো। নির্ঘাত! এরকম একটা মানুষ লিণ্ডা কখনো দ্যাখেনি। কখনো দেখবে বলে কল্পনাও করেনি। হঠাৎ একটা শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বরে তন্ময়তা কেটে যায় তার।

'আমরা পৌঁছে গেছি ক্যাস্টিলোতে!'

বিশাল তোরণ। দেখলেই কেমন অতীতের কথা মনে হয়। গা ছমছম করে। গাড়ি গেটের ভেতরে ঢুকলেই মসৃণ পাথরের ঝক

ঝকে রাস্তা। সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের মাঝখানে সুদৃশ্য ফোয়ারাটি যেন ঐন্দ্রজালিক আবহের সৃষ্টি করেছে। বিচ্ছুরিত জলধারায় সূর্যালোক পড়ে তৈরী হয়েছে অসংখ্য রঙধনু। লিমুজিনটা ওদের দু'জনকে নিয়ে প্রবেশ করলো সেই স্বপ্নলোকে।

২

আকাশের পটভূমিতে দুর্গটিকে বড়ো রোমান্টিক মনে হয় লিণ্ডার কাছে। আলোর বিপরীত দিকে প্রাসাদের শীর্ষদেশ আর মিনারগুলো যেন শিল্পীর আঁকা সিলুয়েট। মধুরঙ দালান এবং কারুকাজ করা দেয়ালগুলো যেন প্রাচীন সৌন্দর্য আর শক্তির প্রতীক। খিলানযুক্ত সেতুটি এক সময় অশ্বারোহীদের যাতায়াতের জন্যেই তৈরী হয়েছিলো। লিমুজিন পারাপারের উদ্দেশ্য নয়।

পুরো ঘটনাটি লিণ্ডার কাছে মনে হচ্ছে অবিশ্বাস্য। স্থান এবং দৃশ্যাবলীর স্বাভাবিকতা সম্পর্কে এখনো যেন সে সন্দিহান। যদিও এই দুর্গের অধিপতি স্বয়ং তার হাত ধরে নামিয়েছে গাড়ির ভেতর থেকে। গাড়ি থেকে নেমে করিম আল খালিদের সামনে দাঁড়িয়ে লিণ্ডা এই প্রথম বুঝতে

পারে, লোকটা কতো লম্বা।

'আসুন।' পিঠের পেছনে আলতোভাবে হাত রেখে বললো করিম। তারপর পাশাপাশি অগ্রসর হলো ওরা সামনের দিকে। খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো বিশাল এক হল-ঘরে। প্যানেলিং করা, কাচ লাগানো কক্ষটি দামী আসবাব পত্রে টৈ টম্বুর। চোখ ঝলসে যায়। মাথাটা যেন কেমন ঘুরে যায় লিণ্ডার। দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে এমনিতেই শরীরটা দুর্বল। তার ওপর অবিশ্বাস্য এই দৃশ্য পরম্পরা। সহ্য করতে পারলো না সে। নেতিয়ে পড়লো করিমের হাতের ওপর। করিম তাকে সঙ্গে সঙ্গে পাঁজাকোল করে নিয়ে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চললো। যেন একটা শিশুকে কোলে তুলে নিয়েছে সে।

'হা ঈশ্বর!' কাতরোক্তি শোনা গেলো লিণ্ডার। কর্মজীবনে প্রবেশ করার কী চমৎকার নমুনা। কোথায় সে চাকরি নিয়ে এই বিদেশে-বিভুঁইয়ে এসেছে একটি শিশুকে দেখাশোনা করতে, এখন তাকেই কোলে নিয়ে হাঁটছেন এক সম্মানিত পুরুষ। তাকেই দেখাশোনা করা দরকার হয়ে পড়েছে এখন।

'আপনাকে এভাবে অপ্রস্তুত করার জন্যে আমি দুঃখিত।' ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলো লিণ্ডা।

'আপনার কিছুই হয়নি। সব ঠিক আছে।' বলতে বলতে মখমলে মোড়া চেয়ারটিতে লিণ্ডাকে বসিয়ে দিলো করিম। 'অমন একটা অঘটনের পর যে-কেউ দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য।

এখন আপনি চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু বিশ্রাম নিনতো সিনোরিটা। আমি এই ফাঁকে একটু কফি দিতে বলি। আপনার শোবার ব্যবস্থা করার জন্যে একটা ঘরও ঠিক করতে বলা দরকার।'

'কিন্তু আমি,' লিণ্ডা ইতস্ততঃ করে বললো, 'আমার তো এখানে, মানে এবাড়িতে থাকার কথা নয়। দোনা দোমায়া নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি তাঁর ওখানেই যাবো।'

'দোনা দোমায়াকে আমি পুরো ঘটনা জানিয়ে এক্ষুণি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।' কথা বলতে বলতে ওপাশের দেয়াল ঘেঁষা ফায়ার প্লেসটার দিকে এগিয়ে গেলো করিম। ওখানে একটা পুশবাটন চোখে পড়ছে। ফায়ার প্লেসটা পাথরের টুকরো জোড়া দিয়ে তৈরী। লিণ্ডা অবাক হয়ে গেলো। কোনো স্প্যানিশ বাড়িতে ফায়ার প্লেস দেখবে, আশা করেনি লিণ্ডা। পরক্ষণে বুঝতে পারলো, শীতকালের জন্যেই এ শৌখিন প্রাসাদে ওটা বানানো হয়েছে। যে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখলো, গৃহ-স্বামী ঘণ্টার বোতামটি আলতো আঙুলে চেপে ধরেছেন। তারপর কি যেন বলে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন তিনি লিণ্ডার পাশে।

'এক পেয়ালা কফি এখন খুব উপকার করবে আপনার। কিন্তু আমি ভাবছি, ডাক্তার ডাকা খুবই জরুরী। ড্রাই-

ভারটাকে বরং পাঠিয়ে দিই। সে আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার নিয়ে ফিরতে পারবে ?'

'না।' লিণ্ডা মাথা নাড়লো। এখন আমার অনেকটা ভালো লাগছে। আপনার ড্রাইভারটা আমাকে না হয় দোনা দোমায়ার বাড়িতে দিয়ে আসুক। সেইটেই ভালো হবে। আমার জন্যে আপনি কেন বিব্রত হবেন, বলুন তো সেনর।'

'বিব্রত হচ্ছি আমি ?' মৃদু হাসলো করিম। 'একজন মাত্র ইংরেজ যুবতীর দায়িত্ব নিয়েই বিব্রত হয়ে পড়বো, আমি বোধ হয় তেমন ননীর পুতুল নই।'

হৃৎপিণ্ডে যেন কাঁপন লাগে লিণ্ডার। কালো চোখ জোড়া অপলকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাতে তীব্র অনুসন্ধিৎসা। চোখ দুটো যেন গভীর সমুদ্র। অজস্র রহস্যে নীল। কে বলবে ওই রহস্যের অন্তরালে কোন সত্য লুকিয়ে আছে ? বুকের ভেতর শঙ্কা জাগে লিণ্ডার। ইচ্ছে হয়, ওই সম্মোহনী চোখ জোড়ার সীমানা পেরিয়ে দৌড়ে পালায় সে। নিঃশ্বাস কি বন্ধ হয়ে আসছে তার ?

আচ্ছা, এখন যদি আকস্মিকভাবে ডন রামোসের আবির্ভাব ঘটতো ! যদি সে-ই নিতো তার দায়িত্ব ! কিন্তু স্বপ্ন টুটে যায় ইউনিফর্ম পরা পরিচারিকার জুতোর আওয়াজে। ভদ্র মহিলার জন্যে কফি আনবার আদেশ দেয়া হয় তাকে।

'এক্ষুণি আনছি প্রভু।' বলতে বলতে দ্রুতপায়ে পাশের ঘরে চলে গেলো পরিচারিকা।

'আমি চা খাই না।' করিম বললো, 'বৃটিশরা অবশ্য চায়েই আসক্ত। আমাদের কফিটা একবার চেখে দেখুন। আশা করি, কফির সঙ্গে সঙ্গে আপনি স্পেনকেও উপভোগ করবেন। এবারই কি প্রথম বিদেশে এলেন?'

'হ্যাঁ সেনর।'

'বেশ আকস্মিক এসে পড়েছেন স্পেনে, তাই না?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় লিণ্ডা। চাচী ডোরিসের কথা মনে হয় তার। তিনি কি সহজে আসতে দিতে চান? শহরতলীর সেই ছিমছাম বাড়িটি। গেটের ওপরে বসানো রয়েছে কোচ-ল্যাম্প। ছোট্ট সীমাবদ্ধ আর রক্ষণশীল একটা জগৎ। সেখানকার কিংস উডকান্ট্রি ক্লাবে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা টেনিস খেলে, ঘোড়ায় চড়া শেখে এবং আখেরে আবদ্ধ হয় বিবাহ বন্ধনে। খুবই একঘেঁয়ে লাগতো এই ধরণের একটা পরিবেশ। কিন্তু কলেজী শিক্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চাচী চাইলেন ল্যারী নেভিনসের সঙ্গে লিণ্ডার বিয়ে হোক। ল্যারী নেভিনস—ক্লাবে যাকে সবাই ডাকতো শুঁটকো ঢ্যাঙ্গা ল্যারী বলে। মনোমঞ্চে ডন রামোস প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে অপসৃত হয়ে গেলো ল্যারী নেভিনসের ছবিটি।

লিণ্ডার মনে তখন থেকে এই ধারণাটি শিকড় গেড়ে বসলো যে তার ভাগ্য ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে। তার নিয়তি

তাকে টেনে নিয়ে যাবে স্পেনেই। এবং তারপর, এই তো এ মুহূর্তে সে স্পেনের মাটিতে।

হঠাৎ তার চিন্তাসূত্র ছিড়ে গেলো করিমের কণ্ঠস্বরে।

'কী ভাবছেন সিনোরিটা! এ দেশে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে সব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে সে সব কথাই চিন্তা করছেন বুঝি।'

'ঠিক ধরেছেন।' জবাব দিলো লিণ্ডা, 'আমার আত্মীয়-স্বজন মোটেই চায়নি যে আমি এখানে আসি। বরং তীব্র আপত্তি জানায় তারা।'

'আপনার বয়স কম, সেই জন্যে বুঝি?'

'সেনর। আমি তেইশ বছর ছাড়িয়েছি।'

'ওরে বাপরে! অনেক বয়স হয়ে গেছে তো।' সকৌতুকে করিম বলে। 'তাহলে ছত্রিশে পা দিয়ে নিশ্চয়ই ভাববেন একদম বুড়ি হয়ে গেছেন!'

'অবশ্যই তা নয়।' বললো লিণ্ডা। আর মনে মনে ভাবলো, আল খালিদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির কাছে কোনো তথ্যই গোপন করার নয়। এমন কি বয়েসও। সে তার তামাটে শরীর নিয়ে বালুকাময় সাম্রাজ্যে ঘোরাঘুরি করে এমন একটি অভিজ্ঞতার অধিকারী যা অর্জন করতে হয় দীর্ঘদিন ধরে। চোখ তুলে তাকালো লিণ্ডা। লাল চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসে আছে করিম আল খালিদ। আর তার চেয়ারের পেছনেই দেয়ালে ঝুলছে এল গ্রেকোর আঁকা ছবি। যা করিমের অখণ্ড

প্রাধান্য আর ব্যাক্তিত্বকেই স্পষ্ট করে তোলে। তার ইচ্ছাই শেষ কথা। তার মুখের ওপর কোনো ব্যাপারেই আপত্তি জানাবার মতো শক্তি শেষ পর্যন্ত বোধকরি কারও হয়না।

যতোই লোকটাকে দেখছে ততোই নানা অদ্ভুত ধারণা মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে লিণ্ডার। নিঃসঙ্গ মানুষটা যেন এক নির্জন-বাসী সন্ন্যাসী। এদেশে আসবার আগে প্রাচীন স্পেনের সুফী শাধকদের সম্পর্কে খানিকটা পড়াশোনা করেছিলো সে। লোকটা তাদেরই উত্তরসুরী? নাকি দুর্গচারি অদ্ভুত এই পুরুষ আসলে জনসমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রেত সাধনায় নিয়োজিত।

অসহ্য নৈঃশব্দ আর বিচিত্র চিন্তার খপ্পর থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই যেন লিণ্ডা বললো, 'আপনি কি তাহলে আমাকে টিনেজার বলে ভেবেছেন?'

'বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি।' করিম নরম, বিস্মিত কণ্ঠে বললো, 'সময় যাকে কঠিন করতে পারেনি, সেই কোমল ত্বকে দাগ বসাবার ব্যাপারটা অবশ্য আমি ভুলে যেতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে গলার ওপর হাত রাখলো লিণ্ডা। হৃদপিণ্ডটা যেন থেকে থেকেই লাফ দিয়ে উঠছে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত। আড়াল না করলে বুঝি তা ওই পুরুষটির চোখে অনায়াসে ধরা পড়বে। লিণ্ডা অবশ্য স্বস্তি ফিরে পেলো দরজার পাল্লাটা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। পরিচারিকা ভেতরে ঢুকলো একটা রুপোর ট্রে হাতে করে। ট্রেটা সে রাখলো একটা ডিম্বাকৃতি টেবিলের

ওপর। কারুকাজ করা টেবিলের রঙ প্রতিফলিত হলো সেটির রুপালি শরীরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কফির মনোহর ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়লো কক্ষটির ভেতর। চীনেমাটির পেয়ালায় কফি ঢেলে, তাতে মেশানো হলো বাদামী রঙের চিনি, সেই সঙ্গে এক দলা মাখন। সত্যি বলতে কি এরকম সুস্বাদু কফি লিণ্ডা জীবনে আর কখনো খায়নি।

'মুই ফাইনো সিনোরিতা?' স্বদেশী ভাষায় জিজ্ঞেস করলো করিম আল খালিদ। অর্থাৎ কফিটা ভালো নয়কি সিনোরিটা?

'ভায়া সেনর!' একই ভাষায় জবাব দিলো লিণ্ডা। যার মানে, 'হ্যাঁ সেনর!'

'বাহ! আপনি দেখছি আমাদের ভাষা জানেন?'

'শিখেছি এখানে আসবার আগে। তবে শেখাটা রয়ে গেছে একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। বিশেষ করে উচ্চারণের ব্যাপারে আমি এখনো নিশ্চিত নই। তবে আশা আছে শিখে নেবো।'

'তাহলে একজন দক্ষ সঙ্গিনী হওয়াই দেখছি আপনার সাধনা। তাই না?' করিম পট থেকে লিণ্ডার পেয়ালায় আবার কফি ঢেলে দেয়। 'তা, টেলিফোনে একটু আগে আমি কি কি কথাবার্তা বলেছি বুঝতে পেরেছেন কি?'

'পেরেছি, আপনি আমার আবাসিক অনুমোদনের ব্যবস্থা করার জন্যে কারো সঙ্গে আলাপ করছিলেন।'

'ঠিক তাই।' লিণ্ডার চেয়ারের পা ঘেঁষে রাখা চামড়ায় মোড়া

পা রাখবার টুলের ওপর সুরক্ষিত বাঁ পা'টা রাখলো করিম।
'আপনাকে অচেতন অবস্থায় গাড়ির ভেতর থেকে যখন আমি বের করে আনি, আপনার হাত ব্যাগটা তখন আনা হয়নি। আনা হয়নি, মানে তখন ওটাকে রক্ষা করবার কথা মনেই আসেনি আমার। অনুমান করছি ওই ব্যাগের ভেতরেই ছিলো আপনার আবাসিক অনুমোদন, ওয়ার্ক-ভিসা আর পাসপোর্ট। ব্যাগটা হয়তো এখনো খোয়া যায়নি বা নষ্ট হয়নি। আমি খোঁজাখুঁজির জন্যে লোক পাঠিয়েছি। আপনার আর সব মালপত্র তো গাড়ির বুটের ভেতরে ছিলো। সেগুলোর আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'
'ব্যাগটা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় আপনার?'
'অন্ততঃ ওই ব্যাগখানার ব্যাপারে আমি আশাবাদী। কেননা ওটা ছিলো আপনার হাতে। এ দেশের আইন কানুন বড়ো কড়া। কাগজপত্রগুলো যদি না পাওয়া যায়, আবার নতুন করে আপনাকে দরখাস্ত করতে হবে।'
'তাহলে? যদি আমার কাগজপত্র হারিয়ে গিয়েই থাকে, তাহলে আবার নতুন অনুমোদন ছাড়া আমি এদেশে থাকতে পারবো না?'
'ঠিক তা নয়।' এক্ষেত্রে আপনি কোনো কাজকর্ম করতে পারবেন না। তর্থাৎ তার বদলে আপনাকে আমার অতিথি হয়ে থাকতে হবে।'
'কিন্তু আমি...'

'পুরুষদের সঙ্গে তর্ক করতে আপনার খুব ভালো লাগে দেখছি।' কথাগুলো নরম গলায় বললো ও করিমের চাউনি-দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, মেয়েদের তরফ থেকে কোনো রকম ওজর আপত্তি শোনার অভ্যেস তার আদপেই নেই। অন্তঃত এ মুহূর্তে তাই-ই মনে হলো লিণ্ডার। করিম বলে উঠলো, 'কোনো স্পেনীয় দুর্গে অতিথি হবার ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই আগ্রহী?'

লিণ্ডাকে নিরব দেখে করিম আবার বললো, 'খুব সম্ভব আমার কথা আপনি বুঝতে পারেন নি?' উদ্বিগ্ন হলো লিণ্ডা। মাথার ভিতরে আবার যন্ত্রণা হচ্ছে তার। সে বললো, 'আমার কাছে টাকা পয়সা একদম নেই সেনর। চাকরী করে বেতন পাবো তবেই হাতে দুটো পয়সা আসবে।'

'ও! তাহলে পয়সাকড়ির চিন্তায়ই আপনি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন?'

'তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে?' জবাব দিতে গিয়ে দু' চোখে পানি এসে পড়লো লিণ্ডার। সে উদ্‌গত কান্না দমনের চেষ্টা করতে লাগলো প্রাণপণে। মাত্র ক' ঘন্টা আগের কথা। কতো আশা, কতো স্বপ্ন নিয়ে, সে নেমে এসেছিলো বিশালদেহী উড়োজাহাজটির ভেতর থেকে। কিন্তু এখন? এ মুহূর্তে? এক অদ্ভুত আগন্তুকের বাড়ির মধ্যে বসে। পরনের পোশাকটি ছাড়া সম্পদ বলতে এ পৃথিবীতে তার আর কিছুই নেই!

'একেই বলে হিতে বিপরীত।' গম্ভীর গলা শোনা গেলো করিম আল খালিদের। 'কোথায় তাঁকে আমি মরণের মুখ থেকে এনে সেবাযত্ন করছি আর তিনি প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ হচ্ছেন নিজের স্বাধীনচেতা আর আত্মমর্যাদার প্রশ্নে। আমার তো মনে হয়, শরীরের বল ফিরে এলেই আপনি এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাবেন?'

লিণ্ডা মাথা নেড়ে মরিয়ার মতো বললো, আমি, আমি তো আপনাকে চিনি না!' দম নিয়ে সে আবার বললো, 'আপনি সহজেই আমাকে দোনা দোমায়ার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে আপনি বারবার আপনার বাড়িতে থেকে যাবার জন্যে চাপ দিচ্ছেন!'

'ঠিক বলেছেন। এ কথা স্বীকার করছি আমি।' চিত্রিত কাঠের বাক্স থেকে একটা চুরুট টেনে নিয়ে করিম বললো, 'ধুমপান করলে কিছু মনে করবেন কি আপনি!'

'আপনার বাড়িতে আপনি চুরুট খেলে কার কি বলার থাকে?' লিণ্ডার ফ্যাকাসে অথচ প্রত্যয়ী মুখের দিকে আড় চোখে তাকায়। তারপর বলে, 'দোনা দোমায় আর তার মেয়েকে কি করুণ পরিস্থিতির মধ্যে এখানে আনি, তাতো আপনাকে বলেছি। সে এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। এতোদিন হয়ে গেছে। সেই অতীতের বিভীষিকা থেকে এখনো পুরোপুরি-মুক্ত নয় সে। এখনো সে নিজের অজান্তেই শিউরে ওঠে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা স্মরণ করে। এ মুহূর্তে তাই

আপনার আচরণের সমালোচনা করা হবে মূর্খের কাজ। আপনিও তো সাংঘাতিক একটা শক্ পেয়েছেন কয়েক ঘণ্টা আগে। আশা করছি, কালকেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন আপনি।'

সিগারে অগ্নি সংযোগ করলো করিম। কক্ষটি ভরপুর হয়ে উঠলো তামাকের চমৎকার ঘ্রাণে। ঘরের মেঝে ঝকঝক করছে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নরম গালিচা। করিমের মাথার উপর কাঠের কারুকাজ করা সিলিং, সেখানে ঝুলছে মুরদেশীয় ঝাড়বাতি। রূপো আর মুক্তো বসানো বড় বড় ক্যাবিনেট। তাতে সাজানো আছে অ্যান্টিক, বই আর অলঙ্কার।

'খুব সম্ভব কালকেই আপনি আপনার দরকারী কাগজপত্র পেয়ে যাবেন। আর তার পরেই আপনি মর্জি মাফিক কাজ করতে পারবেন। তবে আপনার হাতে ব্যাগটা যদি আদৌ না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে আমার মেহমান হয়ে এই প্রাসাদে আপনাকে থাকতেই হচ্ছে।'

এই সোজা সরল বক্তব্যের খোঁচায়ই যেন চেয়ারের ওপর খাড়া হয়ে বসলো লিণ্ডা। বললো, 'এর কোন প্রয়োজন দেখি না।'

'আমি দেখি।' করিম বলে উঠলো, 'আমার চাচাতো ভাই রামোস তার বোনের সঙ্গে ওবাড়িতে বসবাস করছে। আমাদের একটা নিয়ম কানুন আছে না! আপনি এখন স্পেনে—এটা মনে রাখা দরকার।'

'তা তো মনে রাখতেই হবে।' লিণ্ডা কপালের রগটা চেপে ধরলো। বললো, 'ডন রামোস যদি তার বোনের সঙ্গে বাড়িতে থাকেই তাতে অসুবিধাটা কোথায়? কাগজপত্র ঠিক হয়ে গেলে তো ওবাড়িতেই থাকতে হবে আমাকে?'

'হবে। তবে একজন সম্মানিতা কম্প্যানেরা হিসাবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।'

'সেটা কি, জানতে পারি?'

'অবশ্যই। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, যদি আপনার ছাদের নিচে ঘুমোতে পারি, ডন রামোসের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে পারবো না কেন? এটা কি এই কারণে যে, আপনি বিবাহিত আর রামোস এখনো কুমার।'

'না ঠিক তা নয়। এর কারণ এটাই যে আমিই এ ফ্ল্যাটের মালিক। আর রামোস কুমার নয়। সে বিবাহিত। যদিও বউয়ের সাথে থাকে না। আলাদাই থাকে। বুঝলেন সিনোরিটা।'

লিণ্ডা কোনো কথা বললো না। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো তার। এরকম একটা আশঙ্কা আগে থেকেই ছিলো। বেদনায় মনটা ভরে গেলো মুহূর্তের মধ্যে। এখন সে কি করবে? এখানে বসে বসে করিম আল খালিদের সেবাযত্ন কুড়োবে। নাকি তাকে বলবে ইংল্যাণ্ডে যাবার জন্যে একটা প্লেনের টিকিট কিনে দিতে? উহু, চাচীর কথা না শুনে কি মারাত্মক

ভুলটাই না করেছে লিণ্ডা। ভিনদেশীদের অধীনে কোন ভদ্রলোক চাকরি করে? ছিঃ!

কক্ষটি আবার নিরব হয়ে গেছে। সিলিং ফ্যানের অল্প হাওয়াতে সে নিরবতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। বরং সেই হালকা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে চুরুটের ঘন নীল ধোঁয়া। মনের মধ্যে কতো কতো কথা তোলপাড় হচ্ছে লিণ্ডার। চাচীর মুখটা বার বার ভেসে-উঠছে মনচক্ষে। চাচী যেন মুখ ভেংচে বলছেন, 'কী, জেদী মানুষের ঝি। এখন কেমন হলো গো! আমি বাপু বারবার বারণ করেছিলাম ওই অসভ্যদের দেশে যেতে।' দেশে ফিরে যাবার পরের অবস্থাটা কল্পনা করে খুব একটা ভালো লাগলো না লিণ্ডার। দেশে ফেরা মানেই তো, আবার সেই ঢ্যাঙা আর হাবাটার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে গির্জায় যাওয়া। উঃ—এ অসম্ভব।

'ঠিক আছে।' সহসা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলো লিণ্ডা, 'আপনি যা বলবেন, তাই হবে!' তাকে কেমন উদভ্রান্ত, কী রকম যেন হতাশ মনে হলো এবার। যেন মুষড়ে পড়েছে। ভেঙ্গে পড়েছে তার সমস্ত ধৈর্য আর মনোবল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের কাছে গিয়ে ঘণ্টির বোতামে আঙ্গুল রাখলো করিম। বললো, 'আপনাকে খুবই অসুস্থ লাগছে। অ্যাডোরেকশন এর মধ্যে আপনার জন্যে একটা ঘরও ঠিক করে ফেলেছে। আমার মনে হয়, লম্বা একটা ঘুম দেয়া দরকার আপনার। বিকেলের দিকে যখন একটু সুস্থ

বোধ করবেন। নিচে নেমে আসবেন খাওয়া-দাওয়টা সেরে ফেলার জন্যে। আমরা দেরীতেই খাই। চারদিকটা যখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসে, আমরা খেতে বসি সেই সময়েই।'

কি আর করা। লিণ্ডা অগত্যা আত্মসমর্পণকেই শ্রেয় মনে করলো আপাতত। ভরসা একটাই, হাতব্যাগটা যদি মিলে যায়। একমাত্র তাহলেই সে দোনা-দোমায়ার মেয়ের শিক্ষিকা তথা সঙ্গিনী হিসেবে কাজ শুরু করতে পারবে। নইলে এই লোকটি তাকে অনবরত স্প্যানিশ প্রোটোকল দেখাতে দেখাতে পাগল করে ফেলতে পারে। রয়েল হোটেলে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, সেই সুদর্শন মানুষটার কথা মনে পড়লো লিণ্ডার। কতো ভালো মানুষ। আজ এই মুহূর্তে তার যেরকম অসহ্য লাগছে, ডন রামোসের সান্নিধ্যে তা তো ছিলো কল্পনাতীত।

সহসা সচকিত লিণ্ডা দেখলো, নিচু হয়ে তার দুকাঁধে হাত রেখেছে আল খালিদ। 'চলুন তো, এবার একটুখানি ঘুমোবেন। উঠুন। অ্যাডোরেকশন আপনাকে আপনার শোবার ঘরে নিয়ে যাবে।' লিণ্ডা করিমের হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই শক্ত থাবায় তাকে দাঁড় করালো সে। তার পরেই পাঁজাকোলা করে নিলো। লিণ্ডা তার এই স্বচ্ছন্দ শক্তি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলো না। পেশি শক্তি বুঝি একেই বলে।

করিমের কোলে চড়ে দ্বিতলে, কক্ষের দরজা অবদি পৌঁছে লিণ্ডা দেখলো গম্ভীর, ভাবলেশহীন মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে

এক রমনী। কালো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে তার পিঠের উপর। পরনে কালো পোশাক। স্বয়ং প্রভুকে একজন ইংরেজ মহিলা বহন করতে দেখেও তার ভেতরে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সিঁড়ির এতোগুলো ধাপ এইভাবে অতিক্রম করতে দেখে লিণ্ডার মনে এক বিচিত্র ও মিশ্রভাবের উদ্রেক হয়েছে যেন। সোপানের শেষে এক প্রশস্ত করিডোর। দু'দিকের দেয়ালে অনেকগুলো গোল জানালা। করিডোরের মাঝামাঝি পর্যন্ত যেতেই মেহগনি কাঠের দরজাওয়ালা একটি কক্ষের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করলো কালো পোষাক পরা রমনীটি। করিম লিণ্ডাকে বহন করে নিয়ে এমন একটি ঘরে ঢুকলো, সাজসজ্জা এবং জাকজমকের দিক দিয়ে যা একজন রাজ কুমারীরই উপযুক্ত। করিম লিণ্ডাকে আলতোভাবে সেই ঘরের মেঝের ওপর নামিয়ে দিতেই লিণ্ডার মনে হলো, তার দেহের ভাঁজে ভাঁজে লেগে আছে কিছু কঠিন স্পর্শের ক্ষত। করিম একবার লিন্‌ডার দিকে তাকালো। তারপর মেয়েটির দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলো, 'সব কিছু ঠিক আছে তো?' মেয়েটির জবাবের তোয়াক্কা না করেই লিন্‌ডাকে লক্ষ্য করে সে বললো, 'এই রমণী সর্বক্ষণ আপনার হুকুমের অপেক্ষায় থাকবে। আপনার যা দরকার, এর কাছে চাইবেন। যে কোনো অসুবিধা হলে আদেশ করবেন দ্বিধা না করে। মুখখানা এর অভিব্যক্তিহীন মনে হলেও খুব ভালো মেয়ে। নিজের নামটির মতোই ভালো।'

এ্যাডোরেকশন আঙ্গুল তুলে পোষাকের আলমারি দেখিয়ে দিলো লিন্‌ডাকে। অত্যন্ত মূল্যবান পোশাক-আশাকের এক বিপুল মওজুত। করিম বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতে তুললো একটা নাইট গাউন। এমন স্বচ্ছ রাতের পোশাক লিন্‌ডা কখনো দেখেনি। পাতলা গাউনের ভেতর দিয়ে পর পুরুষের কালচে হাত পরিষ্কার নজরে আসে। কেমন যেন ভয় ভয় করে তার। বুকের মধ্যে যেন কি রকম সব শব্দ হয়।

'এ যে দেখছি হারেমের পোশাক।' বিস্মিত গলায় বললো করিম।

'আমাকে বলা হয়েছিলো কম বয়েসী মেয়ের নাইট গাউনের কথা।' সভয়ে উচ্চারণ করে অ্যাডোরেকশন। 'তা, হুজুর যদি অপ্রসন্ন হয়ে থাকেন, আমি এক্ষুণি এটা পাল্টে দিচ্ছি।'

'আমার খুশি বা অখুশিতে কি আসে যায় বলো। সিনোরিটা কিছু মনে করেছেন কিনা? প্রশ্ন সেটাই।' বললো করিম আল খালিদ। তারপর সোজা তাকালো লিন্‌ডার দিকে।

'আমার জন্যে কিছু একটা যোগাড় করতে পেরেছেন, তাতেই আমি কৃতজ্ঞ।' বললো লিনডা।

'আপনার সারা শরীর কাঁপছে।' বললো করিম। তারপর বিছানার ওপর নাইট গাউনটা রেখে বললো, 'খানিকট বিশ্রাম নিলেই আপনার ভালো লাগবে। যখন সুস্থ বোধ করবেন। অ্যাডোরেকশনকে ডাকবেন। নিচে যখন খেতে আসবেন, তার আগে ওকে ডাকবেন। ও আপনার পছন্দসই পোশাক

বের করে দেবে।'

দ্রুতপায়ে দরজার দিকে হেঁটে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো করিম। তারপর মার্জিত ভঙ্গিতে অভিবাদন জানালো খানিকটা ঝুঁকে। বললো, 'আপনি শুয়ে পড়ুন। এক ঘুমে সুস্থ হয়ে উঠবেন।' সে বাইরে বেরিয়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো ঘরের দরজা। লিন্‌ডা ভেবেছিলো, প্রভুর পেছনে পেছনে অ্যাডোরেকশনও বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সে গেলো না। বোধহয় তাকে এখানেই থাকবার আদেশ দেয়া হয়েছে। অনেকটা নিরুপায়ের মতোই সে কক্ষটি দেখতে থাকলো ঘুরে ঘুরে। এই দুর্গের সবগুলো কক্ষই কি এরকম সুসজ্জিত? প্রশ্ন জাগলো লিন্‌ডার মনে। বুঝতে দেরী হয়না, করিম তার কাজের লোকদের বেঁধে রেখেছে নিয়মের কঠিন শেকলে। কঠোর শাসনে। আর লিন্‌ডার বেলায়? মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে করিম আল খালিদ আরো কঠিন, আরো কঠোর।

লিন্‌ডা দেখলো, বিশাল একটা মশারি তার বিছানার ওপর খানিকটা ঝুলে আছে সিলিংয়ের আংটা থেকে। ঠিক যেন একটা ময়ুর ঝুলিয়ে রেখেছে তার বর্ণাঢ্য পুচ্ছ। এরকম চমৎকার একখানা মশারি, লিন্‌ডা স্বপ্নেও ছাখেনি। আর এমন রাজকীয় একটা ওয়ার্ডরোব? যার মাঝখানে বসানো আছে ডিম্বাকৃতি আয়না। সূর্যালোক জানালার রুপোলি গ্রীল-গুলোকে করে তুলেছে তীব্র দ্যুতিময়। বাইরে থেকে হাওয়ায়

ভেসে আছে উপ-সাগরের ঘ্রাণ। আলোর ছটায় দু'চোখে যেন ধাঁধা লেগে যায় লিন্‌ডার। মৃদু কাতরোক্তি করে সে হাতের পাতায় দু'চোখ আড়াল করে। আর এক হাতে টিপতে থাকে কপাল। সে না ডাকলেও দ্রুতপায়ে কাছে আসে অ্যাডোরেকশন।

'যাই, একটুখানি ওডি কোলন নিয়ে আসিগে।' বললো সে। তার কালো কাপড়ে ঘষা লেগে শব্দ হলো বিচিত্র। যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। অ্যাডোরেকশন বেরিয়ে যাবার পর কৌতুহলবশত দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো লিন্‌ডা। তাকালো বাইরের দিকে। কে জানে বাথরুমটা কোন দিকে। হয়তো গোসলটা সেরে নিলে সবচেয়ে ভালো হতো। খুঁজতে খুঁজতে সে পেয়েও গেলো বিশাল বাথরুমটা। বাড়ির সংগে মানানসই স্নানাগার। ধবধপে সাদা তোয়ালে স্তুপ করা আছে তাকের ওপর। আর একটা তাকে সার সার সাজানো রয়েছে নানা রঙের লোশনের জার। সবুজ রঙের বাথসল্টটা পছন্দ হলো লিন্‌ডার। স্টপারটা সরাতেই পাইনের মৃদু সুবাসে বাথরুমটা যেন ভরে গেলো। বাথটবে নেমেই ওর মনে হলো, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। মাথা ব্যাথাটাও কমেছে। যেন আস্তে আস্তে আত্মবিশ্বাসও ফিরে পাচ্ছে লিন্‌ডা। মনে হলো, অদ্ভুত এই দুর্গের ভিতরে আজকের রাতটি সে বাস্তবতার সংগেই অবলোকন করতে পারবে।

স্ফটিক খচিত মিকশ্চার-ট্যাপটা ঘোরাতে গিয়ে লিণ্ডার মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সূত্রপাত হলো। এরকম ঐশ্বর্যশালী একটি বিচিত্র মানুষের খপ্পরে পড়বার ব্যাপারটা যেন কেবল স্বপ্নেই সম্ভব। লিণ্ডা লেনীর পৃথিবীটা ছিলো খুবই সীমিত পরিসরে আবদ্ধ। সেখানে পুরুষ বলতে সে দেখেছে কিছু নিরীহ সঙ্গীত শিক্ষক এবং নিরামিষ সহপাঠিদের। আর দেখেছে ল্যারী নেভিনসকে, একটা শুঁয়ো পোকা মারবার মুরোদও যার নেই। মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্যে সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলো ডন রামোসকে দেখে। কিন্তু ওই আলাপ-আলোচনা থেকে বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারেনি যে, কোনো এক সময় তার সাক্ষাৎ ঘটবে করিম আল খালিদ দ্য তোরেস-এর মতো মানুষের সঙ্গে।

আরামদায়ক প্রকাণ্ড বাথটাবে নেমেই শরীর থেকে পোশাক খুলে ফ্যালে লিন্ডা। বাথটাবটা গভীর। কিন্তু পানির ভেতরে ডুবে যাবার ভয় নেই। সে সাঁতার জানে। বিস্ময়ের সঙ্গে সে নিজেদের বাথরুমের ছোট্ট বাথটাবটির কথা ভাবলো। আর এখানে! এই বাথটাবের মধ্যে যথেচ্ছ দাপাদাপি করলেও এক ফোটা পানি মেঝের পড়বে না। আর এমন নরম সুগন্ধী ফেনা কি কখনো আর গায়ে মেখেছে লিন্ডা! লোকটা ধনী হতে পারে, কিন্তু কতো ধনা! সে ভাবতে লাগলো। আরব দেশে কি এর তেলের খনি আছে? নাকি সে একজন মস্ত বড়ো ব্যবসায়ী, যার বিপুল পন্য সম্ভার-

মরুভূমি পেরিয়ে উটের পিঠের বদলে ট্রাকের বহরে পৌঁছে যায় দিকে দিকে ?

অকস্মাৎ চিন্তাস্রোত থমকে দাঁড়ায় লিন্‌ডার। বাথরুমের খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই শ্যামবর্ণ দীর্ঘ দেহী পুরুষ। যে এতোক্ষণ তার মনটাকে দখল করে রেখেছিলো। 'আপনি এখানে! অ্যাডোরেকশন আমাকে গিয়ে বললো, আপনি পালিয়ে গেছেন।' বললো করিম।

লিন্‌ডা যেন পাথর হয়ে গেছে। সে মাথা নিচু করে রইলো। বাথটাবের স্বচ্ছ পানিতে বাথ-সল্ট্‌ মিশে তা সামান্য অস্বচ্ছ হয়েছে ঠিক,. কিন্তু তাতে তার পোশাকহীন শরীরের একটি অংশও ঢাকা পড়েনি। পাইনের ঘ্রাণ মিশ্রিত সবুজাভ পানির ভেতর এক অপরূপ জলকন্যা যেন নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে। খানিকটা ঝাপসা আয়নায় দেখলে যেমন মনে হয়, লিন্‌-ডাকেও ঠিক সেই রকমই মনে হচ্ছে এখন। অর্থাৎ তার অনাবৃত শরীরের প্রতিটি ইঞ্চিই এখন দৃশ্যমান।

জীবনের দ্বিতীয় বিপর্যয় কি এটাই ? নিজেকে জিজ্ঞেস করে সে মনে মনে। কিন্তু অচেতন হবার মতো শারীরিক অবস্থা সে কাটিয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। খানিকটা ইতস্ততঃ করে বললো, 'আমি—আমি---মানে এই গোসল করছিলাম আর কি!' তার গলাটা কি কেঁপে উঠলো সামান্য ? হাতে ধরা স্পঞ্জের টুকরোটা সে ত্বরিতে রেখেছে তার শ্রেষ্ঠাঙ্গের ওপর। কিন্তু গোটা শরীর ঢাকবার মতো আবরন কই ?

ওদিকে ভিন-পুরুষের চোখের তীর যে অনবরতই বিদ্ধ করছে তাকে।

'তাই তো দেখছি।' বললো করিম।

'আপনি, মানে আপনার এখানে আসা উচিত হয়নি।' বললো লিণ্ডা। এরকম ভয়াবহ অবস্থায় সে আর কি বলবে, ঠিক ভেবেও যেন পাচ্ছেনা। লজ্জায় যেন অসাড় হয়ে যাবে সে এক্ষুণি। ফেনা জমাবার ট্যাপটাও যদি নাগালের ভেতর থাকতো, ফেনার আড়ালে আত্মগোপন করার একটা সুযোগ হলেও হতে পারতো। করিমকে সে ভালোভাবে তো চেনেও না। একজন আগন্তুকের জ্বলজ্বলে চোখের সামনে এভাবে কতোক্ষণ থাকা যায়?

কিন্তু করিম সোজা ভেতরে ঢুকে বললো, 'গোসল যথেষ্ট হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে আমার।' বলতে বলতে একটা বড়ো তোয়ালে তুলে নিয়ে এসে দাঁড়ালো বাথটাবের গা ঘেঁষে। 'আবারো অজ্ঞান হবার আগে চট করে এটা ধরুন তো। গভীর বাথটাবে ফিট হওয়াটা খুব বিপদজনক ব্যাপার কিন্তু।'

সত্যিই এবার মাথাটা ঘুরে উঠলো লিণ্ডার। কেননা কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝবার মতো বুদ্ধি তার রয়েছে। এ কিসের ইংগিত? সভয়ে প্রশ্নটা নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে লিণ্ডা বললো, 'আপনি আর কেন কষ্ট করবেন। আমি নিজেই ম্যানেজ করে নেবো।' সে যোগ করলো,

'আপনি যদি মনে করেন, আমি উঠে আসছি .....।'

'আপনি অবশ্যই উঠে আসবেন।' দৃঢ়তার সংগে এই কথা বলে করিম শিকল টেনে প্লাগ খুলে দিলো। সংগে সংগে দ্রুত বেগে বাথটাব থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করলো পানি। এতটা দ্রুত যে, মিনিটখানেকের মধ্যে লিণ্ডার মনে হলো, করিমের সামনে তার সম্পূর্ণ উলংগ দেহটি প্রকাশিত হতে আর কয়েক সেকেণ্ড লাগবে। প্রায় লাফ দিয়ে উঠে সে স্তূপাকার করে রাখা তোয়ালেগুলোর আড়ালে আত্মগোপন করলো এবং ক্ষিপ্র হাতে একটা তোয়ালে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ফেললো ভেজা শরীরে।

'বাথটাবটা কি অতোই যন্ত্রনাদায়ক ছিলো?' বললো করিম। তার কণ্ঠস্বরে যেন মরুভূমির ক'াকরের শব্দ।

'আমি, আমি অন্য লোকের সামনে স্নান করতে অভ্যস্ত নই!' বললো লিণ্ডা।

'তা তো আমি এখানে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি।' বললো করিম। 'অ্যাডোরেকশন হন্তদন্ত হয়ে আমাকে গিয়ে খবর দিতেই আমি অ'াচ করে ফেলি ব্যাপারটা। দীর্ঘ পথ ক্যাবে এসেছেন। স্নানের প্রয়োজন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই আপনাকে আমি খুঁজতে আসি বাথরুমে।'

লিণ্ডা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। সে মনে মনে চাইছিলো, লোকটা এক্ষুণি বাইরে চলে যাবে। সেই ফ'াকে সে চট করে পড়ে নেবে কাপড়চোপড়। জীবনে কোনো পুরুষের

সামনে এ অবস্থায় পড়েনি লিণ্ডা। সে তোয়ালের স্তূপের আড়ালে, অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে প্রায় পুরোপুরি এসে গেছে করিমের কবজায়। এবং করিমের আচরণে আপত্তি করে--এরকম কোনো প্রাণী এ প্রাসাদে নেই। কিন্তু মনের এ সন্দেহ চোখের তারায় ফুটে উঠতে দিলো না লিণ্ডা। করিমের বাঁ হাতটা পুরোপুরি নজরে আসছে তার। শক্তপোক্ত মানুষ। হাতের আংটিটাই যেন তার মানসিকতাকে তুলে ধরেছে। আংটি অর্থাৎ এক দলা সোনা। ঠিক তার মাঝখানেই খোদাই করা এক উড্ডীন বাজ পাখি।

'আপনি অন্যরকম!' বললো করিম, 'কতো ইউরোপীয় মেয়েই তো এদেশে আসে। সাদা চামড়াকে রোদে পুড়িয়ে তামাটে করার জন্যে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে সাগর সৈকতে। তাদের তো এতো সব রাগ-ঢাকের বালাই দেখিনি। পরপুরুষের সংগে অন্তরংগভাবে মেলামেশাটা তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। আপনি তো দেখছি আদপেই ওদের মতো নন।'

করিম রেহাই দিলো এবার লিণ্ডাকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেলো সে। যেতে যেতে বললো, 'আচ্ছা, পরে দেখা হবে!' দরজা বন্ধ করে হাঁফাতে লাগলো লিণ্ডা। তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছতে মুছতে সে নিজের করুন অবস্থাটা পর্যালোচনা করতে চাইলো। লোকটাকে সে আগেই সন্দেহ করেছিলো। ওর বুকের ভেতর দুপ দাপ

করে শব্দ হচ্ছে এখনো। ভাবছে সে সুদর্শন, সুমার্জিত ডন রামোসের কথা। এই লোকটা রামোসের থেকে কতো আলাদা। চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য থাকলেও করিমের চরিত্রে যেন লাতিন ভাবটা অল্প। সেখানে যেন তার আরব্য অংশটিই বেশী প্রকট। নিজের সুকোমল দেহ আর মনের পাশাপাশি করিম আল খালিদ যেন একটা পাথরের খন্ড। দেহ আর মনের এরকম সাযুজ্য দুনিয়ায় আর একটি মানুষেরও কি আছে? অসম্ভব। মনে মনে ভাবলো লিন্ডা। দিনের বাকি অংশ এই প্রাসাদে সে কিছুতেই কাটাবে না। ত্রস্ত হাতে শরীর মুছে পোশাক পরে নিলো সে। আঙুল চালিয়ে বশে আনলো ভেজা চুল। তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে এলো শোবার ঘরে। সেখানে খাটের ওপর মশারি টেনে দেয়া হয়েছে তখন। কক্ষটি কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন মনে হচ্ছে তাতে। পা থেকে জুতো খুলে বিছানায় উঠে বসলো লিন্ডা। পরণে তার আগের পোশাকটাই। যা তার নিজের। অর্থাৎ ব্লাউজ আর স্কার্ট। যেন এই স্বদেশী পোশাকই তাকে রক্ষা করবে যাবতীয় অমংগল থেকে। কাচ-স্বচ্ছ রাত্রিবাসটা বিছানার এক পাশে তেমনি পড়ে আছে। যে স্বচ্ছতা ভেদ করে ফুটে ওঠা একটা কালচে পেশীবহুল হাত দেখে একটু আগেই শিউরে উঠেছিলো লিন্ডা।

শয্যায় শুয়ে অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করতে লাগলো সে। ক্লান্তিতে দু'চোখ বুঁজে আসতে চাইলেও লিণ্ডা কিছুতেই

ঘুমিয়ে পড়বে না। সে ঘুমিয়ে থাকবে—সেই ফাঁকে একটা লম্বা চওড়া মানুষ এসে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তার নগ্ন-সৌন্দর্য লেহন করবে—তা হয়না। কথাটা চিন্তা করতেও যেন ভয় হয়। মশারিটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হচ্ছে, একটা মাছি আট্‌কা পড়ে গেছে তার ভেতরে। এবং সে-ই হচ্ছে বন্দী মাছিটা। নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানেনা।

স্বপ্নহীন রাতের ঘুম থেকে সে জেগে উঠলো কার হাতের ছোঁয়ায়। দেখলো, মশারিটা তুলে ফেলা হয়েছে। খাটের পাশে তেপায়ার ওপর কফির সরঞ্জাম। শরীরের ওপর দিকটা ভার ভার মনে হওয়ায় পায়ের দিকে তাকালো লিণ্ডা। কে যেন কখন তার গায়ের ওপর একটা কম্বল চাপিয়ে দিয়েছে।

'কি গো ইংরেজ বেটি, রাত্রিতে ভালা ঘুম হয়েছে তো?' লিণ্ডা বালিশে পিঠ রেখে উঠে বসলো আস্তে আস্তে। লক্ষ্য করলো, তার পরনের পোশাক ঠিকঠাক রয়েছে।

'হ্যাঁ, ঘুম হয়েছে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।' বললো লিণ্ডা। সে যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছে। জিজ্ঞেস করলো, 'আমি, আমি সারারাত ঘুমিয়েছি?'

অ্যাডোরেকশন নিজের নিখুঁত ভাবে আঁচড়ানো চুলের ওপর

আলতো ভাবে আঙুল বুলিয়ে বললো, 'আপনার কফি দেবো সিনোরিটা ?'

'হ্যাঁ, দাও।' লিণ্ডার নাকে আসছে কফির চমৎকার ঘ্রাণ। মনটা ভরে যায়। সকালের প্রসন্ন আলোয় তার মনের ভেতরকার অন্ধকারটা যেন কেটে যাচ্ছে ক্রমশ। যার গৃহে সে আশ্রয় পেয়েছে, অদৃষ্টপূর্ব আতিথেয়তা পেয়েছে, তাকে সে বেশ ভুল বুঝেছিলো। আশ্চার্য, মাথা ব্যথাটাও এখন নেই। আজ সে শারীরিকভাবে বাইরে যেতে সক্ষম। কাজেই দোনা দোমায়ার ওখানে চলে যাবে।

'আমার হাত ব্যাগটা কি খুঁজে পাওয়া গেছে ?' জিজ্ঞেস করলো লিণ্ডা।

'আপনার কফি সিনোরিটা।' নির্লিপ্তভাবে কফির পেয়ালাটা পিরিচ সুদ্ধ ওর হাতে তুলে দিলো অ্যাডোরেকশন। ওর মুখ দেখে মনের খবর পাবার কোনো উপায় নেই।

'দোহাই, বলো।' কাতর গলায় বলে উঠলো লিণ্ডা। তার মনে হলো, খবরটা বিশেষ ভালো নয় বলেই চেপে যাচ্ছে অ্যাডোরেকশন।

'আপনার ব্যাপারটা হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করলেই ভালো হয়। উনি এক্ষুণি আসবেন।' অ্যাডোরেকশন সরে গেলো শয্যাপার্শ্ব থেকে।

'আপনার পোশাকটা কুঁচকে গেছে সিনোরিটা। আর এক প্রস্থ কাপড় নিয়ে আসি। আপনি তো হাল্কা পাতলা মানুষ, দশ

নম্বর মাপের পোশাক নিয়ে আসি, কি বলেন ?'

'হ্যাঁ, তাই আনো।' লিণ্ডা বললো। পোশাক আশাকের ব্যাপারে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তার এখন একটি ব্যাপারই জানা দরকার যে, পাসপোর্ট আর দরকারী কাগজ-পত্রগুলো পাওয়া গেছে কিনা। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'বলোনা লক্ষীটি! তুমি নিশ্চয় জানো খবরটা। তোমার কথা আমি সেনরকে বলবো না ঘুণাক্ষরেও।'

'আল্-এক্সেলেন্সি খুবই রাগ করবেন, যদি আমি তাঁর আদেশ অমান্য করি।' এইটুকু কথা বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো অ্যাডোরেকশন। যেন বাতাসে ভেসে গেলো একটা ঘুড়ি। হতাশার সঙ্গে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো লিণ্ডা। হুজুরটি তাহলে প্রচণ্ড ব্যাক্তিত্ববান আর শক্তিশালী পুরুষ। কফি শেষ করে বাথরুমে যাবে লিণ্ডা। তারপরে সোজা গিয়ে হাজির হবে করিমের সামনে। জিজ্ঞেস করবে সরাসরি। নিজের আজ্ঞাবহদের ওপর যতো খুশি চাবুক ঘোরাতে পারে করিম আল খালিদ। কিন্তু লিণ্ডা তো তার কর্মচারী নয়।

কফি শেষ করে বাথরুমে যাবে—অ্যাডোরেকশন এলো পোষাক নিয়ে।

'মনে হয়, এই পোশাক আপনার পছন্দ হবে সিনোরিটা।' বিছানার ওপর ছড়িয়ে রাখলো সে কাপড়চোপড়গুলো। সাদা লিনেনের স্কার্টের সংগে চামড়ার বেল্ট। সাদা লেস লাগানো

একই রঙের জামা। জুতো জোড়ার রঙও সাদা।

'বাঃ! খুব সুন্দর তো!' প্রশংসা না করে পারলো না লিণ্ডা।

'তোমার প্রভুর মুখে শুনলাম, দক্ষিণ আমেরিকার শরনার্থীদের জন্যে এরকম অনেক পোশাক এনে রেখেছেন এ বাড়িতে। তাই নাকি?'

'আপনি ঠিকই শুনেছেন সিনোরিটা। তবে ইদানিং শরনার্থীর স্রোতে খানিকটা ভাটা পড়েছে। অনেক দিন পর বাইরের লোক বলতে এই তো আপনি এলেন।'

সাদা পোশাকটা হাতে নিয়েই দেশের কথা মনে পড়ে গেলো লিন্ডার। যেন এই পোশাক পরে এক্ষুণি সে টেনিস খেলতে যাবে কিংসউড কান্ট্রি ক্লাবে। খানিকক্ষণ খেলে, বিরতির সময় চুমুক দেবে কমলার রসে।

'ক্যাস্টিলোতে অনেক দিন ধরে কাজ করছো তুমি। তাই না?'

'আমি আগে ছিলাম হুজুরের মায়ের খাস চাকরানী।' জবাব এলো। 'উনি মারা যাবার আগ পর্যন্ত। সারা প্রাচ্য জুড়ে যে 'কালো শনিবার' এসেছিলো, তাঁর অসুখটা হয় সেই সময়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর সেরে ওঠেননি। শেখ খালিদের সংগে ওইদিন যে হোটেলে তিনি ছিলেন, সেখানে চলছিলো বেধড়ক লুটপাট। উন্মত্ত জনতা সেদিন ওই হতভাগিনীর চোখের সামনে পিটিয়ে মেরেছিলো শেখ খালিদকে। পরবর্তী দিনগুলোতে তিনি ছিলেন নিজের ছায়া মাত্র।

চকচক করছে সব সময়, সেই দুটি চোখ কি ভোলা যায়? তা, মা-ও চলতো নিজের ইচ্ছে মতো। কোনো ব্যাপারেই তোয়াক্কা করতোনা কারো।

মায়ের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়লেও তার ওপর রাগ মেটেনি লিণ্ডার। নিছক নিজের ইচ্ছেয় চলতে গিয়ে মিরিয়াম অকূলে ভাসিয়ে রেখে গেছে তাকে। চাচী ডোরিস তো নামও শুনতে পারে না মায়ের। সে চায়, লিণ্ডাও যেন ওই সর্বনাশীর চেহারা সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

মায়ের এই মনোবৃত্তিকে কি বলবে লিণ্ডা।

ভালোবাসা?

এ যদি ভালোবাসাই হয়, তাহলে সত্যিই তা অজেয়। শক্তিশালী। মানুষের মনের এই আশ্চর্য অনুভূতির উৎস কি, কে বলবে। যে নামেই এ অনুভূতিকে অভিষিক্ত করা হোক, চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে নিষ্ঠুরতম আঘাত হানতেও সে কার্পণ্য করেনা। এই সব কথা চিন্তা করতে বসলেই মাকে কেমন যেন ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে হয় লিণ্ডার।

চাচী ডোরিসকে মায়ের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র, অনেক মাপা-জোকা মানুষ বলে মনে হয়। অত্যন্ত ছক বাঁধা তার জীবন। অনেকটা অঙ্কের মতো। তাতে হিসেবের পারিপাট্য আছে, কিন্তু হৃদয়ের স্পর্শ নেই।

সুসজ্জিত স্প্যানিশ বেডরুমটি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিলো লিণ্ডা। এখানেই সে আজকের রাতটি কাটিয়েছে। এই

মারাত্মক অনিয়মটিকে কোন্ চোখে দেখতো ডোরিস চাচী। দেখতো বললে অনেক কমিয়ে বলা হয়। এই ঘটনায় অবাস্তবতায় সে শিউরে উঠতো। চীৎকার করে উঠতো আতঙ্কে আর ঘৃণায়। ভাইঝিকে এই রকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দেখলে কিছুতেই তা সহ্য করতে পারতো না সে।

৩

পরিচারিকা লিণ্ডাকে সংগে করে নিয়ে গেলো তার প্রভুর কাছে। প্রভু, অর্থাৎ করিম আল খালিদ তখন রৌদ্রালোকিত চত্বরে একটা বোগেনভিলিয়ার ঝাড়ের সামনে বসে ব্রেকফাষ্ট করছে। লিণ্ডাকে দেখেই করিম উঠে দাঁড়ালো। পরণে তাঁর রাইডিং ব্রিচেস, গায়ে সিল্কের শার্ট। স্বচ্ছ জামা ভেদ করে চোখে পড়ে তার শ্যামবর্ণ, চওড়া বুক।

'আসুন সিনোরিটা, বসুন।' লিণ্ডা চেয়ারে বসবার আগ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলো করিম। 'আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি, রাতের সুনিদ্রা আপনার স্বাভাবিকতাকে ফিরিয়ে এনেছে। বেশ ফ্রেশ লাগছে এখন। আশা করি, মাথার যন্ত্রনাটাও নেই। আমার অনুমান কি ঠিক?'

'হ্যাঁ, সেনর। ঘুমের সত্যি কোনো বিকল্প নেই।' লিণ্ডা তার জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসবার সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে পরিবেশন করা হলো বিলিতি ধাঁচের ব্রেকফাস্ট। বেকন, সসেজ আর গ্রীল্ড্ টম্যাটো। টোস্টের রঙ গাঢ় সোনালি। জারের ভেতর চকচক করছে বিশুদ্ধ মধু। পরিবেশের সঙ্গে যা সম্পূর্ণ মানান সই। কফি, টাটকা টোস্ট আর বেকনের ঘ্রাণে ক্ষুধাটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো তার। সে প্লেট থেকে একটা টোস্ট নিয়ে আলতোভাবে তাতে কামড় দিলো। নাশতা শেষ করে মুখ তুলতেই সে দেখে— করিম কফি খাচ্ছে। তার চোখ লিণ্ডার দিকে।

'অ্যাডোরেকশন দেখছি বেশ ভালো পোশাকই দিয়েছে আপনাকে। বললো সে।'

'হ্যাঁ।' লিণ্ডা সুযোগ পেয়ে বললো, 'আমার জিনিসগুলো কি খুঁজে পাওয়া গেছে সেনর? বিশেষ করে ওই হাত-ব্যাগটা!'

'সমুদ্র বরাবরই খুব স্বার্থপর, বড়ো লোভী হয় সিনোরিটা।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন,' কথাটা শেষ করতে পারলো না লিণ্ডা। তার বুকের ভেতর একটা ভয় জেগে উঠছে যেন।

'আশা করি, আপনি বুঝতে পেরেছেন!' নির্লিপ্ত এবং ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে করিম বললো, 'সামান্য হাত ব্যাগ আর কয়েক টুকরো কাগজের জন্যে এই কাতরতা কেমন বেখাপ্পা লাগে

আমার কাছে। আপনার জীবনটা যে বেঁচে গেছে, সেকথা একবারও ভাবছেন না। আরে প্রাণের চেয়ে হাত ব্যাগ বড়ো হলো!'

'না না, তা নিশ্চয়ই নয়।' লিণ্ডা বলে উঠলো। তারপর চুমুক দিলো কফির পেয়ালায়। কিছুক্ষন পর বললো, 'তাহলে কি ওই পাসপোর্ট আর ভিসা ছাড়া আমার পক্ষে আর স্পেনে থাকা সম্ভব নয়?'

'আপাতত একথা সত্য। এ মুহূর্তে আপনি নাম-গোত্র-পরিচয়হীন এক মরুচারী যাযাবর। তদুপরি পথহারা ও দলভ্রষ্ট!'

লিণ্ডা টেবিলের ওধারে বসা করিমের চোখের দিকে তাকালো। দেখতে চাইলো, সেই চোখে তার জন্যে সাহায্য-সহানুভূতির কোনো ছায়াপথ ঘটে কিনা। কিন্তু না, করিমের কালো চোখের ভাষা পড়ে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। এমনি রহস্যময়, এমনই দুর্জ্ঞেয় সে দৃষ্টি।

'দোনা দোমায়া তো জানেন, আমি এখানে,' লিণ্ডা বললো, 'আমি যে এদেশে বৈধভাবে এসেছি, সে ব্যাপারে তিনি এবং তার ভাই প্রয়োজনে স্বাক্ষ্য দেবেন।'

'তাঁরা যদি এখানে থাকতো, তাহলেই এটা সম্ভব হতো।' করিম বললো, 'কয়েক সপ্তাহ আগে সান লোপেজে যায় ডন রামোস। ওর বোন খুবই অসুস্থ। ওখানকার একটা ক্লিনিকে তার চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসা শেষে তাকে শিগগীর ফিরিয়ে আনা যাবে বলেই ভাবা গিয়েছিলো। কিন্তু মহিলা

সেরে উঠেনি। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, অবকাশ কাটাবার জন্যে বিলিতে গিয়ে ডাক্তার দেখালে তিনি নাকি আরো উন্নত চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন। গতকালকেই 'গ্রাঞ্জা' থেকে আমার কাছে মেসেজ এসেছে রামোসের। বোনের সুচিকিৎসার ব্যাপারে সময় নষ্ট করতে চায় না সে।'

লিণ্ডার মাথায় যেন বাজ পড়লো। বলে কি এ লোকটা! তাহলে! তাহলে উপায়?

'ফল টল কিছু একটা নিন সিনোরিটা। এই টসটসে নেকটারিনগুলো বেশ মিঠে আর রসে ভরা। আমার তো মনে হয়, স্বর্গোদ্যানে আপেলের চাইতে এগুলোর মর্যাদাই বেশি হওয়া উচিত ছিলো। ইভ কেন যে এই আকর্ষণীয় জিনিস রেখে আপেলের মতো পদ্যময় ফলটিতে কামড় লাগালেন, আমার তা মাথায় আসেনা। এ ব্যাপারে আপনার কি মত সিনোরিটা?'

লিণ্ডা সভয় দৃষ্টিতে করিমের দিকে তাকালো। লোকটা কি মানুষের মনের ভেতরটা দেখতে পায়? পড়ে ফেলতে পারে মেয়েদের গোপন ভাবনাগুলো? হয়তো পারে। ভাবলো লিণ্ডা। অনেক মেয়ের সঙ্গেই তো মেলামেশা করেছে করিম। নারীচরিত্র আঁচ করতে তাই কোনো রকম বিলম্বও হয়না তার। তাছাড়া, দুনিয়ার সবাই তো আর লিণ্ডা লেনী নামের এই ইংরেজ মেয়েটির মতো হাবা গোবা নয়। যে মেয়েটি চেলোর ঝংকার যতোটা বোঝে—পুরুষ চরিত্র তার

এক চতুর্থাংশ নয়।

'তা, পেপিতার খবর কি?' জিজ্ঞেস করলো লিণ্ডা।

'মা আর মায়ের সঙ্গে খুকিও গেছে সান লোপেজে। সেখানে ওর দেখা শোনার জন্যে রামোসও নিশ্চয় গভর্নেস রেখেছে ইতিমধ্যে।'

'কেন? গভর্নেস রাখবেন কেন? পেপিতাকে সেখানে আমিই তো গিয়ে দেখাশোনা করতে পারতাম?'

'না।'

লিণ্ডা এই আপত্তির কারণ জিজ্ঞেস করবার ভরসা পেলো না।

'প্রশ্নই ওঠে না।'

এবার আর নিশ্চুপ থাকেনা লিণ্ডা।

'কেন, জানতে পারি?' সে জিজ্ঞেস করে। চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে লিণ্ডা। দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'আপনি তো প্রতিপত্তিশালী মানুষ। আমার ওয়ার্কিং ভিসাটা কিভাবে খোয়া গেছে কর্তৃপক্ষকে আপনি সেকথা বুঝিয়ে বলতে পারবেন না?'

'কেন পারবো না!' করিম বললো, 'অবশ্যই পারি।' টকটকে লাল একটা নেকটারিন ছুরির ফলায় বিঁধিয়ে শূন্যে তুলে সে বললো, 'কিন্তু কাজটা আমি করতে ইচ্ছুক নই।'

'বলছেন কি আপনি!' সংলাপটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হলো লিণ্ডার কাছে। এমন কথা ঠাণ্ডা মাথায় কেউ কখনো বলতে পারে? বিস্মিত কণ্ঠে সে বলে উঠলো, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই আমাকে আপনার প্রাসাদের

ভেতরে আট্‌কে রাখছেন। তাই না?'

'হ্যাঁ। অনেকটা তাই।' করিম তার হাতের তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলায় বিদ্ধ করলো আর একটি ফল। তারপর তা বাড়িয়ে ধরলো লিণ্ডার দিকে।

'একটু চেখে দেখুন।'

'না, আমি খাবোনা।'

'ছিঃ! কী ছেলেমানুষী করছেন, বলুন তো! নিন্।' হঠাৎ ছুরির ফলা থেকে লাল ফলটা তুলে নিয়ে মুখের ভেতরে ফেলে চিবুতে শুরু করলো লিণ্ডা। সে চট করেই অমন নরম হয়ে পড়লো খুব সঙ্গত কারণে। এখানে একগুঁয়েমী করে খুব একটা ফায়দা নেই। কোনো লাভ হবেনা। বরং ক্ষতির পাল্লাটাই ভারী হবার আশঙ্কা।

কালকেই লিণ্ডা ভেবেছিলো, ডন রামোসের ফিরে আসতে দেরী হবেনা। কিন্তু যা শুনলো, তাতে বোন আর ভাগ্নীকে নিয়ে রামোস কবে ফেরে, কোনো ঠিক নেই। তর্থৎ এ মুহূর্তে গ্রাণ্ডায় নেই কেউ। সবচেয়ে বড়ো কথা, এখন লিণ্ডা আল খালিদের মুঠোর মধ্যে।

'আপনি দেখছি কম্প্যানেরা হবার ব্যাপারে অটল!' খালিদ চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'বেশ তো, আমাকেই সঙ্গ দিন নাহয়। হয়ে যান আমার কম্প্যানেরা।' করিমের কথা-গুলোকে বেশ অর্থবহই মনে হয়। 'কিছুদিনের জন্যে আমারও ঠিক এরকম একজন সঙ্গিনীর দরকার। আপনি কিন্তু প্রার্থী

হিসেবে বেশ মানিয়ে যান।'

'আপনি এটা কি বলছেন?' লিণ্ডা বিস্মিত কণ্ঠে বললো, 'আমি তো এখানে এসেছি একটা শিশুর দেখাশোনা করার জন্যে। কোনো পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের মাস্টারী করার উদ্দেশ্যে নয়।'

'আপনার দায়িত্বের ধরনটা কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে অনেকটা একই রকম।' চেয়ারে হেলান দিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে চুরুট গুঁজে দিলো করিম আল খালিদ। তারপর সোনায় তৈরী লাইটার বের করে জ্বালিয়ে নিলো সিগারটা। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে, সেই ধোঁয়ার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো করিম। লিণ্ডার মুখটা ঝাপসা দেখাচ্ছে এখন।

'আমাকে বই টই পড়ে শোনাবার একজন মানুষ দরকার আমার। আমি গান-বাজনা শুনতেও ভালোবাসি। পেপিতাকে পিয়ানো বাজানো শেখাবার কথাও তো ছিলো আপনার, তাই না?'

'হ্যাঁ, পিয়ানো আমার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। তবে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি, চেলো বাজাতে। ডন রামোস বলেছিলেন, গ্রাণ্ডায় নাকি একটা পিয়ানোও আছে!'

'আপনি চেলোও বাজাতে পারেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি দেখছি বিশেষ সাংস্কৃতিক গুণ-সম্পন্না রমণী!'

'তেমন আর কি, ওতো কেবল বাদ্য-বাজনার বেলায়।'

'এর পরেও যদি কোন গুন থাকে, তাহলে তো সাংঘাতিক

ব্যাপার।' কথাগুলো করিম এমনভাবে বললো, যেন চাকরিতে লিখা যোগ দিয়ে ফেলেছে। কথাবার্তা পাকা। কাজ শুরু হবে এই মুহূর্তে।

'আর কী কী গুন আছে আপনার ওই বাদ্যি-বাজনায় দখল ছাড়া?'

'আপনি যা ভেবে রেখেছেন আমাকে দিয়ে সে কাজ হবেনা সেনর। আপনার মহিলা সংগী হবার মতো যোগ্যতা আমার আদপেই নেই। যা শক্ত নার্ভ আপনার। বাপরে বাপ।'

'আমি আপনার সম্পর্কে যা কিছুই ভেবে থাকি—মনে করবেন, তা অত্যন্ত সম্ভ্রম-পূর্ণ। আমার সুন্দর কথা বলছেন, তাই না? কিন্তু নার্ভ কি আপনারও খুব শক্ত নয়? দুর্বল চিত্তের মেয়ে হলে আপনি কিছুতেই আমার বাড়িতে আসতে পারতেন না। মুখোমুখি এক টেবিলে বসা তো দূরের কথা। দেখুন, অশুসিক্ত কোনো মেয়েকে ঘাটানো আমার রীতি নয়। আমার সম্পর্কে দু'একটি কথা শুনে নিলে আমাকে বুঝতে আপনার সুবিধে হবে হয়তো। স্থানীয় ভাষায় আমাকে বলতে হবে সলটেরো, এর অর্থ যে-পুরুষ বিয়ের কথা আদপেই চিন্তা করেনি। কখনো নয়। অথচ আমি এমন একজন মানুষ যার সম্পত্তি রয়েছে স্পেনে এবং মধ্যপ্রাচ্যে। যে কোনো ধনাঢ্য মানুষের পুত্র সন্তান কামনা থাকা স্বাভাবিক। যে সন্তান সব দিক দিয়ে হবে তার উত্তরাধিকারী। মানুষের সেই মৌলিক আকাঙ্ক্ষাটা এখন আমি পুরণ করতে

চাই। কিন্তু চাইলেই যে মানুষ নিজের মনের মতো করে সবকিছু পাবে, তেমন কোনো কথা নেই। আমি জন্ম থেকেই প্রেমহীন, ভালোবাসাহীন। আমার এই বয়েসে, আমি আজ পর্যন্ত এমন কাউকে পাইনি, বন্ধনহীন আনন্দে যে আমার হৃদয় পূর্ণ করে দিয়েছে। ফলে ভালোবাসা নামক কোনো গুজবে আস্থা স্থাপন করাও সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।'

কথা বলতে বলতে করিম অপলকে তাকিয়েই রইলো লিণ্ডার মুখের দিকে। সে আবার বললো, 'আমি আপনার ভেতরকার সেই দুর্লভ আলোটি দেখতে পেয়েছি সিনোরিটা। সন্ধান পেয়েছি এমন একটি চরিত্রের, যাতে রয়েছে এক ধরনের অসাধারণ বিনম্রতা। যা পূরণ করতে পারে আমার আকাঙ্খা। তাই বিনয়ের সংগে প্রস্তাব করছি যে, আপনাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আপনি আশা করি রাজি হবেন এবং আমাকে উপহার দেবেন একটি সন্তান। সেই সন্তান পুত্র সন্তান হলে আমি বেশি খুশি হবো। কেননা এ পৃথিবী পুরুষ প্রজন্মের প্রতিই অধিক দয়ার্দ্র। তবে পুত্রই যে হতে হবে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। সন্তানটি যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলেও আমি একই রকম আনন্দিত হবো। কেননা আমার অবর্তমানে সেই সন্তান হবে আমার সম্পত্তির একক অধিকারী। আর যদি আমি অবিবাহিত অবস্থায় মারা যাই, আমার সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যাবে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে। আর একই সঙ্গে তাদের ভেতর আরম্ভ

হবে বাদ-বিসম্বাদ। কে বেশি পেলো, কে কম পেলো, এই নিয়ে চলবে তুলকালাম কাণ্ড। দেখুন সিনোরিটা, ধনী মানুষের বউ হলে সুবিধা আছে। সে অবস্থায় চাকরিদাতা হিসেবে কেউ আপনার ওপর হুকুম চালাতে পারবেনা। সবচেয়ে ভালো পোশাক আর অলঙ্কার পরবেন আপনি। সবচেয়ে বড়ো লাভ, এ বিয়ের পেছনে সক্রিয় থাকবে মস্তিষ্ক। হৃদয় নয়। কেননা হৃদয় মানুষকে ক'াটা বিছানো পথটির প্রতিই দিক-নির্দেশ করে—গোলাপ বিছানো পথে নয়।'

সিগারেটটা মুখেই রয়েছে করিমের। পুড়তে পুড়তে আগুনটা ঠোঁটের প্রান্ত স্পর্শ করার একটু আগে তা হুআঙুলের ক'াকে তুলে নিলো সে। কাঙালের মতো তাকিয়ে রইলো লিণ্ডার মুখের দিকে। এতো কথার মধ্যে একটি কথাই আলোড়িত করেছে লিণ্ডা লেনীর মন। 'আমার জন্ম হয়েছে প্রেমহীন এক পরিবেশে।' সম্পূর্ণ আবেগবর্জিত ভাষায়, মুখের একটি রেখাতেও সামান্য কম্পন না তুলে করিম উচ্চারণ করেছে কথা কটি। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক একটি বাক্য। এবং বিস্ময়কর তো বটেই। যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেলো লিণ্ডার। অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম হয়েছে তার মনের মধ্যে। এরকম তো আর কখনো হয়নি? অল্প আগে উত্থাপিত প্রস্তাবের একটি দিকে যে যৌনতারও অংশ রয়েছে, তা যেন চোখ আর মন, দুটোকেই এড়িয়ে গেলো লিণ্ডার।

না, একথা ভাবার অবকাশ নেই যে এই লোকটির স্ত্রী হতে পারার কল্পনায় সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। লোকটা অকপটে স্বীকার করেছে যে, কাউকে ভালোবাসার মতো অনুভূতি তার কখনো ছিলোনা। নিজের একজন উত্তরাধিকারী এ পৃথিবীতে রেখে যাবার স্থূল কারণেই সে এখন বিয়ে করতে চায়।

'যে পুরুষের হৃদয়ে প্রেম নেই, সে কি কখনো সন্তানের পিতা হতে পারে?' লিণ্ডা স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলো।

চওড়া কাঁধে একটা ঝাঁকানি তুলে করিম ছাই ঝাড়লো চুরুটের। 'আবেগের দিক থেকে বিচার করলে হয়তো পারেনা।' সে বললো, 'কিন্তু আমরা মূলত বসবাস করি টাকা আনা পাইয়ের পৃথিবীতে। এখানে অর্থের বিনিময়ে অনেক শর্তই পূরণ হয়ে যায়। আমি আমার স্ত্রীকে দিতে পারি যাবতীয় সুযোগ সুবিধা। যেখানে বিয়ে এবং বিচ্ছেদ খুব সাধারণ একটি আচারে পরিণত হয়েছে, সেই পৃথিবীতে সম্পদের ক্ষমতার কথা কে অস্বীকার করবে? আরব এবং স্পেন উভয় ক্ষেত্রেই আয়োজিত বিবাহের সুফল প্রমাণিত হয়েছে।'

'তাহলে একজন স্প্যানিশ অথবা আরব যুবতীকে বিয়ে করছেন না কেন সেনর? স্রেফ একটা আগন্তুককে এভাবে বিয়ে করতে চাওয়ার কারণ কি?' কথা বলবার সময় লিণ্ডার চোখে নিস্কম্পভাব। মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ। প্রায় আত্মসমর্পণ করার পরও করিমের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেয়নি সে। তারা পরস্প-

রকে চেনেনা বললেই চলে। এ মুহূর্তে কেবল এটুকুই বোঝা যায় যে করিম আল খালিদ একজন মহা সম্পদশালী ব্যক্তি এবং লিণ্ডা লেনীর কাছে একটি কপর্দকও নেই। যদি করিম কোনো মেয়েকে কিনতেই চাইতো, তাহলে কালো চুল আর রোমান্টিক বাদামী চোখের কোনো লাতিন সুন্দরীকে সে বেছে নেয় নি কেন? কিংবা পূর্ব দেশীয় কোনো রমনীকে, একজন পুরুষের হৃদয় জয় করার যাবতীয় ছলাকলা যাদের আয়ত্তে থাকে?

'আপনি যা বলছেন, তা সত্য।' করিম বললো, 'দুনিয়ায় এমন সুন্দরী অনেক রয়েছে যারা কোনো ধনবান স্বামীর ঘরের বউ হবার জন্যে ওঁৎ পেতে আছে। কিন্তু আপনার মধ্যে রয়েছে তিনটি বিশেষ গুণ। সত্যি বলতে কি, এই তিনটি গুণের সমন্বয় আমি আর কারোর মধ্যেই দেখিনি। প্রথম আপনি বৃটিশ। আমি আমার জীবনে এমন কোনো বৃটিশ রমনী দেখিনি, যে ভীরু। আমি সঙ্গীত ভালোবাসি। যিনি সঙ্গীত চর্চা করেন, তিনি আমার কাছে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত। সবচেয়ে যা বড়ো কথা, তাহলো, আমার জানা মতে, আপনি একজন কুমারী।'

সম্ভ্রমনী এই শব্দাবলী দু'জনের মধ্যবর্তী হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। হঠাৎ কোত্থেকে গুঞ্জন তুলে উড়ে আসে একটা মৌমাছি। বসে পড়ে ফুলের স্তবকের ওপর। করিমের ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির আভাস লিণ্ডার দৃষ্টি এড়ায় না।

'আমি কি আপনাকে বিব্রত করলাম ?'

'না—না !'

'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, সত্যিই অপ্রস্তুত করেছি আপনাকে। খুব সম্ভব আপনিও গোড়া থেকেই ভালোবেসে আসছেন কেবল সঙ্গীত চর্চাকেই। কোনো পুরুষকে ভলো বাসবার সময় পাননি। আর ঠিক এই কারণেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে আপনার কুমারীত্ব।'

'আমার কুমারীত্বের ব্যাপারে আপনাকে খুবই নিশ্চিত মনে হচ্ছে আল খালিদ।' লিণ্ডা করিমের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলো তীব্র এক অনুসন্ধানী-সতর্কতা। হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো লিণ্ডার মুখ। এমন সুগভীর লজ্জা সে কখনোই আর উপলব্ধি করেনি। আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো, 'জানেন, বিলেতে আমার এক বয়ফ্রেণ্ড রয়েছে।'

'তাই নাকি ?' ঈষৎ কটাক্ষ করেই করিম বললো, 'আপনার দেশ ত্যাগ এবং ভিন্নদেশে আগমন থেকেই আপনাদের বন্ধুত্বের গভীরতা আমি মাপতে পারছি।

'গার্লফ্রেণ্ড জীবিকার ব্যাপারে সাময়িকভাবে অন্য দেশে গেলে ইংরেজ পুরুষরা কিছু মনে করেনা। বরং সেই অনুপস্থিতি তাদের প্রেমকে আরো গভীর করে।'

'আমার সন্দেহ আছে এ ব্যাপারে।' দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে ওঠে করিম, 'মানলাম, বিলেতে সত্যিই এমন কোনো তরুন রয়েছে যে আপনাকে বিয়ে করতে চায়। মধুবরণ চুল আর পোখ-

রাজ-চোখ দেখিয়ে আপনি তাকে সত্যি মাতাল করে দিয়েছেন। আপনাকে পাবার জন্যে সত্যি সে আকুল। কিন্তু বিপরীতে আমি এমন একজন যুবতীকে দেখতে পাচ্ছি, যার অনুভূতিতে ধরা পড়েনা পুরুষ-হৃদয়ের উত্তাপ। আপনি যে প্রকৃতিগতভাবে নিরুত্তাপ, তা আমি এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছি।'

সহসা টেবিলের ওপর খানিকটা ঝুঁকে পড়ে, লিণ্ডার মুখভাব লক্ষ্য করে করিম। বলে, 'আপনি যে পুরোপুরি ভাবে আমার দখলে, তা বোধহয় বুঝতে পারেননি এখনো। আপনি খুব সম্ভব এও জানেন না যে, প্রথাসম্মত বিবাহ-অনুষ্ঠান ছাড়াই আমি আপনাকে স্থায়ীভাবে অধিকার করতে সক্ষম। না,না— এতে উৎকণ্ঠার কিছু নেই। আপনি যদি আমাকে একটি সন্তান দেন, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনুযায়ী আপনি আপনার প্রাপ্যটুকু ঠিকই পাবেন। পাবে আমার সন্তানও। আদালতের এখতিয়ার নেই সে অধিকার খণ্ডনের।'

'আমি যে আপনাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, সে ব্যাপারে আপনি দেখছি নিশ্চিত।' কথাগুলো লিণ্ডার মুখে কেমন যেন অদ্ভুত শোনালো। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে এই লোকটির সঙ্গে তার পরিচয়। কিন্তু তার বিচিত্র চরিত্র দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সে এতোখানি কাছাকাছি চলে এসেছে লিণ্ডার। কোন্ রহস্য সুপ্ত রয়েছে এই লীলার অন্তরালে? কী সেই দুষ্টের ইঙ্গিত? কার সে ইঙ্গিত? পথের ওপর যে সব্জীর ঝুড়ি ফেলে রেখেছিলো,

একি তারই খেয়ালের খেলা! কী নাম সেই খেলোয়াড়ের? কিসমত? ভাগ্য?

'আপনার জীবন বাঁচিয়েছি আমি।' দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে করিম বললো, সাদামাঠা কথায়, 'আপনি আমার কাছে ঋণী। ঋণ মুক্ত হবার জন্যে আমাকে একটি সন্তান দিয়ে, জীবনের বিনিময়ে জীবন। কি বলেন?'

'আপনি সকাতরে একটি সন্তান কামনা করছেন, তাই না, আল খালিদ?' লিণ্ডার বুকের ভেতরে যেন ড্রাম পেটাচ্ছে কেউ। এই মানুষটার জন্যে আবারো তার মনের মধ্যে অবিশ্বাস্য করুণার অস্তিত্ব অনুভব করছে সে। করুণা হচ্ছে তারই জন্যে, যে লোকটির সবকিছু থাকলেও অন্তরে নেই ভালোবাসা। সে বললো, 'আমি কী রকম মেয়ে, আপনি তার কতটুকু জানেন? আমি তো এরকম স্বার্থপরও হতে পারি, যে সবকিছু হু'হাতে ভরে নেয়, অথচ দেয়না কিছুই? আমি একথাই বলতে চাই যে, একটি বইয়ের মলাট দেখেই তার বিষয়গত মন্দ ভালো নির্ধারণ করা যায়না।'

'মানলাম। কিন্তু এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, আপনি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক একটি চরিত্র। আর নিজের ব্যাপারে বলতে পারি একথাই যে, আমার ভিতরে এক ধরনের বন্যতা রয়েছে। কাল আমি স্নানাগারে ঢুকে পড়লে আপনি যেভাবে আঁতকে উঠেছিলেন, তা, সহজে ভোলার নয়। আপনি যখন স্পঞ্জের টুকরো হাতড়াচ্ছেন, আমার মনে হলো, ওটা

আমাকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়ে মারবেন।'

'ভাবলে নেহাৎ মন্দ হতো না বোধ হয়।' করিমের চোখে এক ধরনের কৌতুক খেলা করতে দেখলো লিণ্ডা।

'আমার নজর থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যেই কি ওরকম করেছিলেন?'

'আমি—আমি ভাবছি, পুরনো প্রসঙ্গ আলোচনা করে কী লাভ? দোনা দোমায়ার গ্রাঞ্জায়ই যখন আমার ঠাঁই হলোনা, তাহলে আর স্পেন দেশে থাকারও কোনো দরকার নেই। বরং আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে স্পেনের টিকিটের টাকাটা ধার দেন, চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আমি ইংলণ্ডে ফিরে যেতে চাই।'

'এই ক্যাস্টিলোতে আপনার বাসোপযোগী বিশাল কক্ষ রয়েছে। আপনার যদি এই বাড়ি পছন্দ না হয়, তাহলে আমরা মরক্কোয় যেতে পারি। সেখানে রয়েছে আমার মরু-ভবন। আগে ওখানে থাকতো নার্সরা। সে হলো গিয়ে ঔপনিবেশিক আমলের কথা। এক ধর্মীয় সংগঠন ওখানে খুলেছিলো সেবাসদন।'

'আপনি আমাকে যতোই ধারনা দিতে চান না কেন—ভরি ভোলার নয়। আপনাকে আমি বিয়ে করবো না।' লিণ্ডার মনে হলো, তার ইচ্ছেগুলো একটা পাথরের প্রাচীরে লেগে ঠিকরে পড়ছে।

'আপনার সঙ্গে মরক্কোয় যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার।

আমি বাড়ি যাবো। দেশে চলে যাবো।'

'কি বাচ্চাদের মতো কথা বলছেন? উঠতি বয়েসের মেয়েদের মতো আচরণ করুন।' আশঙ্কাজনকভাবে সরু হয়ে এলো করিমের দুটি চোখ। 'আমি কোনো রকম বেআইনী কাজ করিনা। আমার কথা শুনুন। বিছানায় আমার পাশে শোবার আগেই নিয়ম মাফিক আমার বউ হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত কি করবেন, তা নিতান্তই আপনার ব্যাপার। তবে আমার মনে হয়, রক্ষিতা না হয়ে স্ত্রী হলেই আপনি সবদিক দিয়ে লাভবান হবেন।'

'অসম্ভব চিন্তা ছাড়া এসব আর কিছুই নয়। আপনি কি করে ভাবছেন, আপনার প্রস্তাব মেনে নেবার জন্যে আমি মুখিয়েই আছি! আপনার সিদ্ধান্ত একান্তই আপনার। আমাকে সেসবের সঙ্গে কেন জড়াচ্ছেন, বলুন তো?' কথাটা লিণ্ডা জোর দিয়েই বললো। কিন্তু বললে কি হবে? সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে করিমের অকম্প ভাবলেশহীন মুখ। যেখানে সংকল্পের দৃঢ়তা ছাড়া আর কোনো কিছুরই ছাপ নেই। লোকটা যেন একটা সবল যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেমহীন বিবাহের পর সে লিণ্ডাকেও ব্যবহার করতে চায় সন্তান উৎপাদনের আর একটি যন্ত্র হিসাবে। লিণ্ডাকে সে নির্বাচন করেছে একারণেই যে মেয়েটি কুমারী। এবং এতে কোনো সন্দেহও নেই যে সে তার পথ থেকে এক চুলও সরে দাঁড়াবে না।

'আপনার ঘাড়টা মটকে যেতো। আমিই তা অক্ষত রাখতে সাহায্য করেছি।' চোয়াল শক্ত করে করিম বললো চিবিয়ে চিবিয়ে। যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে। 'আপনার কি কিছুই দেবার নেই?'

'আর কতোবার এ প্রশ্ন করবেন, আল খালিদ?'

'আপনার বিরক্তির কারণ আমি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারছি না।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লিণ্ডার মুখখানাকে জরিপ করতে করতে করিম বললো, 'একঝুড়ি বানানো স্তুতিবাদেই কি আপনি খুশি হতেন? যদি বলি, আমি গভীরভাবে আপনার প্রেমে পড়ে গিয়েছি, তাহলে কি আরো বেশি খুশি হবেন? কী হলো? কথা বলুন।'

'ন্-না।'

'না? এই তো পথে এসেছে লক্ষ্মী মেয়েটি। আপনি যে এক-জন ডাগর প্রেমিকা, তা আমি বেশ ভালোই জানি। প্রেম, এই শব্দটিকেই আপনি মনে করেন স্বর্গে যাবার পাস-ওয়ার্ড। এজন্যেই তো দুনিয়ার ডন জুয়ানেরা সাফল্যের সঙ্গে এর সদ-ব্যবহার করছে। যেন শোবার ঘরে ঢোকার এ এক 'সিসেম ফাঁক' মন্ত্র। যাই হোক, আমি আশা করছি, আপনি আমার সঙ্গে না-যুঝে ইতিবাচক সাড়া দেবেন।'

'আমাকে আপনি কেন চান?' লিণ্ডা বললো, 'আমি তো আপনার অর্থবিত্তের কাঙাল নই। একটা কথা শুনুন বলি। আপনি যদি আপনার এ চাপ অব্যাহত রাখেন, আমি আপ-

নাকে ঘৃণা করবো। যাকে বিয়ে করতে চান, তার কাছ থেকে কি চান? ঘৃণা, নাকি ভালোবাসা?'

'কিছুই চাইনা আমি।' করিম বললো, 'আমি আমার একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। আপনি বিশেষভাবেই পুরস্কৃত হবেন এজন্যে। কি হলো, অমন চমৎকার নাকটা কুঁচকে ফেললেন কেন বলুন তো? আপনি সামান্য একটা কম্প্যানেরা পদের জন্যে এতোদূরে এসেছেন, ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ বিস্ময়ের, বুঝলেন! আরে, পোশাকটা পাল্টালেই তো কম্প্যানেরা আর পরিচারিকার ভেতরে তফাৎ থাকেনা কোনো। আমার তো মনে হয়, চাকরির জন্যে নয়, আপনি স্পেনে এসেছেন আসলে বিলেত থেকে পালিয়ে আসবার মতো কোনো মৌলিক কারণে।'

নাড়ির স্পন্দন থেমে গেছে বলে মনে হলো লিণ্ডার। টেবিলের ওপাশে বসা মানুষটার অন্তর্ভেদী চোখ দু'টি যেন তার হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। কেবল হৃৎপিণ্ড নয়, বুকের ভেতর যা যা আছে কোনো কিছুই যেন তার নজর এড়িয়ে যায়নি। চেয়ারে বসে থাকাটা অসম্ভব মনে হলো লিণ্ডার পক্ষে। সে অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়ালো চেয়ার থেকে। হেঁটে গেলো পার্শ্ববর্তী সরনির দিকে। পাথরে ঢাকা পায়ে চলার পথ। দু'পাশে পামগাছের সারি। লিণ্ডা হঠাৎ সেই পথের ওপর দিয়ে দৌড় দিলো।

দৌড়োচ্ছিলো—হঠাৎ পিঠের ওপর শক্ত দু'টি হাতের স্পর্শে বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলো লিণ্ডা। করিম ওকে সবল ধাক্কায় নিজের দিকে ঘুরিয়ে আনলো। সকালের কাঁচা আলোর মধ্যে দেখা গেলো, দু'জন মানুষ প্রাণপণে ধ্বস্তাধস্তি করছে। ধ্বস্তাধস্তি লিণ্ডাই করছিলো। করিম তাকে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো কেবল। সাদা পোশাক পরা ফুটফুটে মেয়েটি যেন আটকা পড়া প্রজাপতির মতোই ছটফট করছে। যেন কোনোভাবে একবার ছুটতে পারলেই উড়ে পালাবে।

'কোথায় পালাবেন আপনি? কতোদূর?' জিজ্ঞেস করলো করিম।

'নিজের ওপর আপনার খুব আস্থা, তাই না।' লিণ্ডার উল্টো-প্রশ্ন। হাত ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করেও লাভ হলোনা কোনো। যেন লোহার বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছে লিণ্ডা লেনী। হতাশভাবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সে। না। আর কোনো আশা নেই। করিম আল খালিদের দুর্গ-ভবনে সে বন্দী। সে তাকে কোনোখানেই আর যেতে দেবেনা।

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।' করিমের বিলম্বিত জবাব, 'আমার আস্থার ব্যাপারে আপনার ধারনা সঠিক। আমি একবার যা চাই, তা আমি যেভাবেই হোক অর্জন করে নিই। আপনি এখন মারাত্মক অনিশ্চয়তায় ভুগছেন, তাই না। কিন্তু

নিশ্চয়তার মধ্যেই বিদেশ বিভুঁইয়ের পথে পা বাড়িয়েছিলেন আপনি। এমন কিছুর জন্যে স্পেনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন, যা আপনি নিজের দেশে পাননি। কি সেই জিনিস? যদি তা নিতান্তই অ্যাডভেঞ্চার হয়ে থাকে, তাহলে মন্দ কি। চলে আসুন—আমরা বিয়ে করে ফেলি। আমরা তো একে অন্যের কাছে অনাবিস্কৃত দেশ। কে জানে, আমরা পরস্পরের সান্নিধ্যে গিয়ে কী পেয়ে যাবো!'

'ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। স্বেচ্ছাচারিতা আর দম্ভ।' বললো লিণ্ডা। কিন্তু যে অনুভূতিটি তাকে মুহূর্তে অধিকার করলো সে সম্পর্কে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না সে। করিমের স্পর্শ তাকে আশ্চর্য রকম শিহরিত করছে এখন। কাঁধের ওপর হাত রেখেছে করিম আল খালিদ। কিন্তু শিহরন কেবল কাঁধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সেখান থেকে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে নারী-দেহের অন্যান্য স্পর্শকাতর জায়গায়। তার হাঁটুর পেছন দিকটা মনে হচ্ছে খুবই দুর্বল। সে যেন নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছে না এখন। এ কি করে সম্ভব? তার তো এরকম হবার কথা নয়। করিমের ছোঁয়া তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন এক ধরনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। যেন করিম এখন বর্তমান কালের মানুষ নয়, প্রাচীন স্পেন দেশীয় ষাঁড়ের লড়াইয়ে সে অংশ নিয়েছে। হাতে তার ইস্পাতে তৈরী ব্যাণ্ডেরিলা। ষাঁড় যখন অদম্য হয়ে উঠবে, যখন ব্যাণ্ডেরিলা দেখেও সে ভড়কাবে না, তখন করিম আল

খালিদ ব্যবহার করবে তীক্ষ্ণধার তলোয়ার। এক কোপে নামিয়ে ফেলবে উন্মত্ত ষাঁড়ের গলা। চেলো বাজানো ছাড়া যে মেয়ে আর কোনো কিছুই ভালোবাসতে পারেনি, তার হঠাৎ এমন হচ্ছে কেন? মনে হলো, বুলরিংয়ের লড়াকু ষাঁড়ের মতো শেষ অব্দি লিণ্ডাকেও বুঝি বধ করবে করিম।

তাকে তো চুমু খেয়েছে ল্যারি নেভিনসও। কিন্তু সেই আলিঙ্গন ও চুম্বন ছিলো লাজনম্র। ভীরু। তাতে লিণ্ডা লেনীর শীতল শরীরে বিন্দুমাত্র উত্তাপও সঞ্চারিত হয়নি। কিন্তু করিমের সামান্য ছোঁয়ায় একি বিদ্যুত? লিণ্ডা মোচড় মেড়ে হাত ছাড়াতে গেলো। কিন্তু এর ফল হলো বিপরীত। করিম সজোরে নিজের দিকে টেনে নিলো লিণ্ডাকে। লিণ্ডা প্রতিবাদ করার জন্যে দুই ঠোঁট ফাঁক করতেই করিম সেই ওষ্ঠযুগলকে তীব্র চুম্বনে আবদ্ধ করে ফেললো। আর সে কি চুম্বন। কী তীব্র কী অনাস্বাদিত। কী বন্য—কী অভাবিত! স্যার নেভিনসের সেই তাৎক্ষনিক ও শুকনো চুমুর সঙ্গে এই চুমুর কতো তফাৎ। লিণ্ডা বোধহয় এক্ষুণি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। ক্রমশ তার চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে আসছে। বোধহয় সে এক্ষুণি লুটিয়ে পড়বে রাস্তার ওপর। সে কেবল একটি ব্যাপারই স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে যে— এক বন্য উচ্ছাসে ভেসে যাচ্ছে কোন্ অজানা নদীর ওপর দিয়ে। এক জোড়া-পুরুষ ঠোঁট যেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে তার রেশম কোমল ওষ্ঠ। কিন্তু পারছে না। লিণ্ডার মনে হচ্ছে, তার ঠোঁট দুটিতে

যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

করিম আল খালিদ যে আবেগের দাস নয়, তা লিণ্ডা বিশ্বাস করছে। কিন্তু একি চুম্বন। ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলো সে। শরীরের অন্য অংশেও যদি করিম এরকম চুমু খেতে শুরু করে?

'দোহাই।' মাথাটা জোর করে সরিয়ে নিতে গেলো লিণ্ডা।

'ভালো লাগছে না? আমার চুমু ভালো লাগছে না বুঝি?' বললো করিম। লিণ্ডা হাঁফাতে লাগলো। বললো, 'বুঝলেন—ভালোবাসা দিয়ে কিছুই হয়না। আপনি নিজেও তো বলেছিলেন, প্রেম কি বস্তু-তা কখনো উপলব্ধি করেননি।' কথা ক'টি সে বললো বটে, কিন্তু তার অনুভব করতে দেরী হলো না যে, একটি ভারী দেহ তার শরীরের দিকে ক্রমশঃ ঘনিষ্ট হয়ে আসছে। কেমন গরম হয়ে গেলো তারা সারাটা শরীর। এক ধরনের উষ্ণতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। নিজের নিয়ন্ত্রন-শক্তি হারিয়ে ফেলছে সে। দেহের ভিতরে অভাবিতপূর্ব কি যেন একটা হচ্ছে। মন আর দেহের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে একটা ব্যবধান। দেহের দাবিটাই যেন বড়ো হয়ে উঠছে। অত্যন্ত জরুরী সে দাবি। থর থর করে কাঁপতে থাকা তার মসৃণ ত্বককে আরো একটু কাঁপিয়ে দিয়ে একটা বলিষ্ঠ হাতকে সে দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে একটি নির্দিষ্ট কোনের দিকে অগ্রসর হতে দেখলো।

'তোমার দেহকে আমি অনুভব করতে চাই।'—অস্ফুট গলায়

করিম বললো। কুমারী মেয়ের অনাঘ্রাত সুরভি নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিতে চাই। আমিই তোমার জীবনের প্রথম পুরুষ যে পুরুষ ঠিক এইভাবে তোমাকে আদর করছে। আমি তোমাকে স্পর্শমাত্রই তা আঁচ করতে পেরেছি। তুমি একেবারেই আনকোরা। আমার ভাগ্যের সত্যিই কোনো তুলনা নেই।'

বলতে বলতে হঠাৎ লিণ্ডাকে ছেড়ে দিলো করিম। ছেড়ে দিয়েই দেখলো, পার্শ্ববর্তী পাম গাছের গুঁড়িতে লিণ্ডার স্কার্টের সুতো আটকে আছে। হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো তার মুখের ওপর। বললো, 'আমার মনের ভেতরকার তরুন বাজ পাখিটা ছিলো পলাতক। সে হঠাৎ কোত্থেকে ফিরে এসেই গোলমালটা বাঁধালো। তছনছ করে দিলো তোমাকে।' করিম এই প্রথম লিণ্ডাকে তুমি সম্বোধন করলো। —বিবাদ বিসম্বাদ আর কেন লিণ্ডা? আমাদের যোগাযোগটা নেহাৎ কাকতালীয় নয়। একে বরং বলতে পারো অলৌকিক। কিছু দিন যাবৎ আমি ভাবছিলাম বিয়ে করবো। আর তুমিই যে আমার মনোনীতা তা বোধহয় খুলে না বললেও চলবে।'

'যদি আমি তোমার পছন্দসই না হতাম—?' লিণ্ডাও এখন তুমি সম্বোধন করছে।

'তাহলে আর কি হতো এমন।' তুড়ি মেরে করিম বলে উঠলো, 'তুমি বিলেত গিয়ে সেই যুবককে বিয়ে করতে তোমার

আবেগ অনুভূতির কোনো খবরই যে রাখেনা। কোনো পুরুষ যদি তাকে উত্তেজিত করে তবে কোনো মেয়েই তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেনা। আমার ধারনা, তুমি একে আপছন্দ তো করোই— সময় বিশেষে একে অত্যাচার বলেও মনে করো। তবে হ্যাঁ, এটাও ঠিক যে তোমার আধখানা আবার বেশ উত্তেজিত। তুমি মাথা নাড়ছো? নাড়ো। কিন্তু আমি ঠিকই বলেছি।'

'না।' যেন নিজেকেই প্রভাবিত করতে চায় লিণ্ডা—'ওকে নয়।'

'হ্যাঁ।' সে আবারো ওর দিকে অগ্রসর হয়। তারপর আবার চেপে ধরে সেই পাম গাছটার সঙ্গে। এবারও হাত দিয়ে নয়— শরীর দিয়ে। ছটফট করে লিণ্ডা। ক'কিয়ে ওঠে— 'না না না।' কিন্তু সেই সশব্দ আপত্তি হারিয়ে যায় নিজেরই এক নিঃশব্দ সম্মতির চোরাবালিতে। আর এর প্রমাণ তার চোখ।

'এই না শব্দটি তোমার কথাবার্তার তালিকা থেকে হঠাও তো এবার।' আস্তে আস্তে চাপ দিতে দিতে করিম বললো— 'আমাদের দু'জনের মধ্যে বাক্যালাপের সময় এখন আর এ শব্দটা মানায় না।'

'আমি— আমি তোমাকে ভালোবাসি না—'

'ভালোবাসা হচ্ছে,' করিম ওর ঠোঁটের কাছাকাছি নিজের ঠোঁট জোড়া এনে বললো, 'অর্থহীন একটা শব্দ। এটা

তুমি আমি দু'জনেই মনে করি। কী মসৃণ তোমার ত্বক, কী উজ্জ্বল তোমার চুলগুলো। তোমার নিতম্ব কী চমৎকারভাবে সাড়া দেয়। তুমি আমাকে উপহার দেবে একটি সুন্দর শিশু। এটাই হচ্ছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। একজন আগন্তুক-মহিলার বাচ্চার কল্যাণের চেয়ে নিজের সন্তানের মা হওয়াই কি ভালো নয়?'

'প্লীজ—'

'তুমি যখন প্লীজ শব্দটি উচ্চারণ করো— তোমার ঠোঁট দু'টি তখন যেন চুম্বনের আমন্ত্রন জানায়।' বলতে বলতে নিজের মুখটা আবার লিণ্ডার মুখের ওপর নামিয়ে আনে করিম। লিণ্ডা যেন প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে। মনে হয় সুগঠিত শ্যামবর্ণ মুখখানা তার ভালো লাগছে। ত্বকের ওপর একটি হাতের স্পর্শ তার দেহের মধ্যে সঞ্চার করে অনন্য আনন্দ। পামগাছের কাণ্ডে নিজের একটি হাত সজোরে চেপে রেখে মনের উচ্ছাসকে যেন ঢেকে রাখতে চাইছে লিণ্ডা। ইচ্ছে হচ্ছে, দু'টি হাত আলতোভাবে রাখে ওর বলবান, চওড়া কাঁধের ওপর। আঙুলগুলো নিসপিস করছে ওর শরীর স্পর্শ করার জন্য। করিম ওর সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে আজ। ভাবতে ভাবতে সে কাঠ হয়ে যাচ্ছে যে, বহু বছর চেষ্টা করেও কোনো পুরুষ যে মেয়েকে বশ করতে পারেনি, মাত্র চব্বিশ ঘন্টায় সেই মেয়ের অত্যন্ত কাছে চলে এসেছে অদ্ভুত মানুষটা। বিস্ময় আর বাঁধ মানে না লিণ্ডার।

লিণ্ডার এই প্রচ্ছন্ন আত্মসম্পর্নের ইচ্ছা নিজের অন্তর্ভেদী অবলোকনে ঠিকই দেখে নিয়েছে করিম আল খালিদ। এই মূহুর্তের আগে পর্যন্তও যে শরীরটি চেলোতে সুমধুর সুর সৃষ্টির একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা, করিম সেই যন্ত্রে সঞ্চার করেছে যৌবনের উদ্দাম শিহরন। শীতল দেহে সঞ্চার করেছে অনিন্দ্য উত্তাপ। লিণ্ডা তবুও শীতল হয়ে যেতে চাইছে বারবার। কিন্তু পারছে কোথায়? আলিঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে বরং লক্ষ্য করলো তার স্তনের দ্রুত ওঠা-নামা। কোমল উষ্ণ সেই মাংসপিণ্ড দু'টি যেন বারংবার আছড়ে পড়ছিলো আল খালিদের বুকের প্রাচীরে।

'আমার ধারনা, তুমি আমাকে বিয়ে করবে।' বললো করিম। অকম্প চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সে আবার বললো, 'মনে হচ্ছে, তোমার প্রতিরোধ-প্রবৃত্তিটা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।'

'আমি তোমাকে কতটুকু চিনি।' প্রতিবাদ করে লিণ্ডা— 'আমি কি করে তোমার এই উচ্চ মার্গের জীবন ধারার সঙ্গে নিজেকে জড়াই?'

'কেন জড়াবে না? অজানা দেশ আবিষ্কারেই তো প্রকৃত আনন্দ। জানা জিনিসে সুখ কোথায়?' বুকের মধ্যে আরো একটু জোরে চেপে ধরে করিম বললো। দু'টি শরীর এখন যেন বাঁকে বাঁকে মিলে গেছে। লিণ্ডা একটা বন্য নিঃশ্বাস ছাড়লে—মৃদু হাসি ফুটে উঠলো করিমের মুখে। আরো

একটি নিঃশ্বাস পড়লো ওর। চোখের তারা দুটি ওর বড়ো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

'আমাকে ডুবিও না।' ফিস ফিস করে বললো লিণ্ডা, 'ক্ষমতার জোরে তুমি যা খুশি তাই করতে চাইছো। যা ইচ্ছে তাই-ই করতে চাইছো আমাকে নিয়ে।'

'ঠিকই বলেছো তুমি!' লজ্জাহীন কণ্ঠে বললো করিম, 'কিন্তু প্রস্তাবটা লুফে নিচ্ছো না কেন বলো তো। দুটি প্রাণই কেবল দু'জনকে খুশি করতে পারে। একজন পুরুষ বিয়ে করবে একটি মেয়েকে। এই সত্যটি মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়?'

'না!' লিণ্ডা আবার ছটফট করতে লাগলো। ছাড়া পেতে চায় সে আবারো, বলে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে যেতে দাও। দোহাই তোমার।' সজোরে ধাক্কা দিলো সে। কিন্তু এক চুলও নাড়াতে পারলোনা করিমকে। বললো, 'আমি দেশে ফিরে যাবো, আমি ফিরে যাবো আমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে। চাচী আমাকে কতোবার মানা করেছিলো। আমি তার কথা অমান্য করেছিলাম বলেই আমার এমন বিপদ।'

'খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহিলা তোমার চাচী।' বললো করিম। 'তবে বড়ো ফাঁড়াটা আল্লের জন্যে কাটাতে পেরেছো। না-পারলে গতকাল বাক্সবন্দী অবস্থায় তোমাকে রওয়ানা হতে হতো ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে।'

কী নিষ্ঠুর তুমি! খালি অলক্ষুণে কথা বলো। আশ্চর্য

মানুষ। হৃদয় বলতে ভেতরে কিছু আছে কি?'

'হৃদয়হীন এবং অকপট।' লিণ্ডার হাত মুঠোয় নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলো করিম। আশ্চর্য, হৃদ-স্পন্দন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। স্পষ্ট এটা অনুভব করতে পারলো লিণ্ডা।

'আমার হৃদয়টা হচ্ছে একটি যন্ত্র, বুঝলে?' করিম বলে উঠলো, 'ভালোবাসা নামক কোনো রকম আবেগে এই যন্ত্রটি কখনো আক্রান্ত হয়নি। আমি যখন শিশু, তখন আমাকে ভালোবাসার জন্যে মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই। মায়ের মুখ আমি দেখেছি তার বাঁধানো ছবিতে। আমি কখনো পাইনি তার শরীরের ঘ্রাণ। অনুভব করিনি আমার গালে তার চুমু। আমি মাইনে করা মানুষের কোলে মানুষ হয়েছি। তারপর আমাকে এমন একটি স্কুলে পড়তে পাঠানো হয়, যেখানে প্রথমেই শেখানো হয় স্বনির্ভরতা।

স্কুলের পাঠ শেষ হলে আমি ভর্তি হই মিলিটারী একাডেমীতে। ভর্তি হবার প্রথম বছরেই যুদ্ধ বাঁধে মধ্যপ্রাচ্যে। আমি সৈন্যদলে নাম লেখাই। কতো শত্রুকে গুলি করে মেরেছি। আবার কতো বন্ধুকে শত্রুর গুলিতে আহত অথবা লুটিয়ে পড়তে দেখেছি আমার পাশেই।'

করিম একটু থামলো। লিণ্ডাকে সে উপরোক্ত কথাগুলো বুঝে নেবার সময় দেয়।

'আমি চাই, আমার সন্তান তার মাকে দেখবে, জানবে। মাকে

ভালোবাসবে। মায়ের ভালোবাসা পাবে। লিণ্ডা তোমার কাছে ভালোবাসা চাইনা। তবে তোমার মধ্যে এমন কিছু আমি দেখতে পেয়েছি, যা নাকি আমার আশাপূর্ণ করতে পারে। আর সেজন্যেই তো তোমাকে পাবার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছি আমি। বেপরোয়া হয়ে উঠেছি আমি। শোনো লিণ্ডা, এক্ষুনি এই পাম গাছের নিচে আমার বাহু বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় আমার সন্তান গর্ভে ধারণ করবে তুমি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলো লিণ্ডা। লোকটা বলে কি? যেন বাজ পড়েছে তার মাথায়। জীবনে কখনো সে ভাবতে পারেনি, কেউ কোনো দিন তাকে এরকম অদ্ভুত, এমন ভয়ঙ্কর কথা বলতে পারে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে করিম নিজের বুকের মধ্যে আরো জোরে চেপে ধরে লিণ্ডার বুক। আদিম হিংস্র একটা সরীসৃপ যেন শরীর বেয়ে বেয়ে উঠছে লিণ্ডার। সে বাঁধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে হতাশা কণ্ঠে বললো, 'আমি আমি জানিনা, কী ভাবে মুক্তি পাবো তোমার খপ্পর থেকে।'

'অতএব সে চেষ্টায় বিরতি দাও।' লিণ্ডার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো করিম। একটা টোকা দিলো ওর কণ্ঠার হাড়ে। বললো, 'শোনো, লড়াই করার জন্যে তোমার জন্ম হয়নি। তুমি অন্য দিক দিয়ে চাঞ্চল্যকর দক্ষতার অধিকারী। সেই দক্ষতা প্রমাণের সময় এসে গেছে।'

'না!' লিণ্ডা মনে মনে স্থির করলো এই লোকটির অশুভ

প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার কিছুতেই নয়। সে সজোরে মাথা ঝাঁকালো। কিন্তু করিমের কনুইয়ের গুঁতো লেগে প্রচণ্ড ব্যথা পেলো।

'তোমার মায়াবী কথার ফাঁদে ফেলতে চাইছো আমাকে। তাই না? নোংরা কথা বলে চাইছো উত্তেজিত করতে!'

'সদ্য-পরিচিতদের মিঠি মিঠি বোলে আমি অভ্যস্ত নই।' বেশ আমুদে গলায় করিম বললো, 'এই যেমন তুমি আর আমি। আমরা যখন পরস্পরকে চুমু খাই, তখন কি নিজেদের সদ্য-চেনা মনে হয়?'

'তোমার কথায় এবং আচরণে আমি যেন কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি।' নিঃশ্বাস ফেলে লিণ্ডা বললো, 'মনে হয় আমি ফাঁদে পড়ে গেছি।'

'যেন ফাঁদে পড়া তিতির। তাই না?' বলে উঠলো করিম। লিণ্ডাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো তফাতে। তারপর এমন ভাবে তাকালো যেন, দৃষ্টিশক্তি দিয়েই সে সাদা পোশাকটি খুলে ফেলেছে এই ইংরেজ-তনয়ার শরীর থেকে। এবং আশ্চর্য—রমণীকে নিবারণ করেই কেমন যেন নিস্পৃহ হয়ে পড়লো পুরুষটি।

এক ধরনের বৈরাগ্য কিংবা নিরাশক্তি নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো রৌদ্রোজ্জ্বল পথের ওপর। আশ্চর্য মানুষ··! আরব্য আলখাল্লা পরার যার দরকার নেই। প্রয়োজন নেই শিরবন্ধনী কিংবা লেদার বুটের। ওই সব ছাড়াই যে প্রতিটি ইঞ্চি এক-

জন সম্রাট। যে নির্ভীক চিত্তে শত্রু হনন করেছে রণক্ষেত্রে। গ্রহণ করেছে একজন রমণীকে, প্রেমহীন ভালো-বাসাহীন।

'ভিতিরের এখন সময় হয়েছে।' হেসে ওঠলো করিম। লিণ্ডা চমকিত হলো রোদ্রে পোড়া ঠোঁটের ফাঁকে তার ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখে।

'কিন্তু আমার চাচী?' লিণ্ডা বললো, 'তাকে তো একবার জানানো উচিত।'

'তোমাকে খুব আদর করেন বুঝি উনি?'

'অবশ্যই।'

'আমার কিন্তু বিশ্বাস হয়না।' সন্দেহ পোষণ করে করিম আল-খালিদ। 'তুমি এখন সাবালিকা। বিয়েসাদীর ব্যাপারে অন্য কারো মতামত না হলেও চলবে তোমার। এব্যাপারে আমাদের দুজনের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে মনে করা উচিত। তুমি স্পেনে এসেছো তোমার নিজের মতো করে জীবন কাটাতে। কি? ঠিক বলিনি?'

'তা ঠিক।' সে সম্মতি জানায়। তারপর রাগত গলায় বলে, 'কিন্তু জীবন যাপনের ধারাটি শুরু হবার আগেই পড়ে গেছি তোমার মতো একটি পাগলের খপ্পরে। তুমিই নিয়ে নিয়েছো আমার যাবতীয় দায়দায়িত্ব।'

'আমি নিশ্চয়তা দিতে পারছি বলেই দায়িত্ব নিচ্ছি।' আবার ঝকঝকে করে উঠলো করিম আল খালিদের মুক্তোসদৃশ দাঁত-

গুলো। 'আমি এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমার সঙ্গে জীবন কাটাতে পারবে তুমি খানিকটা রোমাঞ্চের মধ্যে। যা তুমি কখনো পাবে না তোমার চাচা-চাচীর পরিবারে। খুকি হে, তোমার চোখের ভাষা আমি পড়ে ফেলতে পারি খুব সহজেই। তোমার চাচীর বিবরণ যেটুকু শুনেছি, তাতেই আমি আঁচ করে ফেলেছি তার অনেক খানি।'

'চাচা অবশ্য ভালো মানুষ।' লিণ্ডা বললো, 'কিন্তু ডোরিস চাচী বেশ গোলমেলে মহিলা। সত্যি বলতে কি, তার জন্যেই আমার দেশ ছাড়তে হয়েছে।'

'কী করেছিলেন তিনি?'

কাঁধ ঝাঁকালো লিণ্ডা। ল্যারি নেভিনসের সঙ্গে তার বিয়ের আয়োজনের কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেলো সে। বললো, 'আমি চাচীর কথা মতো অর্কেষ্টার যোগ না দিয়ে অন্য কোথাও চাকার করতে চেয়েছি বলেই তিনি খাপ্পা হয়ে উঠেছিন আমার ওপর। আমি সঙ্গীত ভালোবাসি। তবে কিনা, আমি চেয়েছিলাম সলোইস্ট হতে। কিন্তু শিখতে আরো খানিকটা বাকি ছিলো আমার।'

'বেশ তো, এবার নিজের সাধটি পুরণ করে নাও।' করিম বললো, 'তুমি হবে আমার সলোইষ্ট। আমাকে বাজিয়ে শোনাবে তুমি। বাজাবে শুধুই আমার জন্যে।'

লিণ্ডা চেয়েছিলো এব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতে। কিন্তু অবকাশ হলো না। তার আগেই করিম বলে উঠলো, 'বিয়ে

হবে আমাদের প্রাচ্যে গিয়ে।' যেন সিদ্ধান্ত পাশ হয়েই আছে। ভাবখানা এরকম। বললো, 'যেখানে যোজনব্যাপী বিস্তৃত মরুভূমিতে সময় তার গতি হারিয়ে ফেলে যেখানে সোনার বলের মতো চমৎকার চাঁদ ওঠে রাতের আকাশে। পরিকল্পনাটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না?'

'আমার পছন্দ অপছন্দে কারো কিছু যায় আসে, আল খালিদ?'

'ঠিক।' নির্লজ্জের মতো হাসলো করিম। 'তবে তুমিও শুনে রাখো, তোমার সমস্ত প্রতিরোধ মোকাবেলা করা হবে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইলো লিণ্ডা।

'পপি কাকে বলে, জানো?'

'তুমি পারবে না।' ভয়ার্ত গলায় লিণ্ডা জানালো।

'তাহলে চেষ্টা করেই দেখো একবার।' চ্যালেঞ্জ জানালো করিম।

লিণ্ডা ওর ভাস্কর্যপ্রতিম মুখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। করিম মিথ্যে বড়াই করে না বলেই মনে হয়।

'মনে হয় তোমাকে দিয়ে তা সম্ভব।' লিণ্ডা বললো।

'ঠিক ধরেছো।' করিম বলে চললো, 'নরনারীর সম্পর্কের মাঝখানে এমন কিছু ব্যাপার আছে যা চিরকালই আদিম। আর আমার ব্যাপারে এটা পরিষ্কার বলে দিতে পারি যে আমাকে দিয়ে ভদ্দরলোকের অভিনয় করানো কারো পক্ষেই সম্ভব

নয়।

'তোমাকে দুর্নীতিবাজ মানুষ বলে মনে হচ্ছে আমার।' লিণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলে বললো।

'বলতে পারো। আমার এ ব্যাপারে সাফ কথা একটাই যে, মেয়েরা যখন তাদের পোশাক টেনে ধরে থাকে, তখন পুরুষের একমাত্র কাজ হলো তা হ্যাচ্‌কা টানে খুলে ফেলা। আসলে মেয়েরা পুরুষের প্রভুত্বকেই মনে প্রাণে পছন্দ করে।'

'আমিও কি তাহলে একজন প্রভু লাভ করতে চলেছি?'

'কেন, এব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে নাকি তোমার?'

'আমি কোনোদিন কারো তর্জন-গর্জনের মধ্যে শাসিত হবো বলে কামনা করিনি।'

'আমি যে কোনো কঠোর শাসকের চেয়েও মারাত্মক মানুষ।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'মনে হওয়া নয়, তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো দোনচেলা!'

'দোনচেলা মানে আবার কি? শব্দটা জীবনেও শুনিনি।'

'এর অর্থ হলো কুমারী। তুমি যা, তাই আরকি!'

'আমি যদি কুমারী না হই, তাহলে তুমি কি করবে?'

'মনে করবো প্রতারিত হয়েছি।' জবাব দিলো করিম।

'তাহলে স্বদেশী মেয়ে বিয়ে না করার ব্যাপারে তুমি স্থির প্রতিজ্ঞ?'

'একরকম তাই-ই!' সে আমতা আমতা করে বললো। 'আমি তোমাকে চাই, অন্য কিছু—অন্য কাউকে নয়।'

'তোমার ক্রীতদাসী হিসেবে?'

'তাতেই বা ক্ষতি কি?' সামান্য হাসলো করিম। 'নারী হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কামনা আসলে এটাই, কিন্তু তারা অযথা লড়াই করতে চায় এর বিরুদ্ধে। পুরুষকে আনন্দ দেয় নারীর দেহ আর মন তাদের যুক্তি নয়। এই সত্যটি তারা যতো বেশি উপলব্ধি করতে পারবে—পৃথিবী হয়ে উঠবে ততো মনোরম। মেয়েরা যখন দেহমন সম্পূর্ণ সপে দিয়ে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পন করে, তখনই তারা সবচেয়ে সুন্দর। তারা হচ্ছে আবেগের তোরণ। পুরুষ খোলে সেই গেটের তালা।'

'প্রাচ্য দেশীয় দর্শন?'

'অবশ্যই।' করিম পোশাকের ওপর দিয়ে আলতোভাবে স্পর্শ করে লিন্‌ডার উন্নত বুক।

যুগপৎ ভয় এবং উত্তেজনা অনুভব করে লিন্‌ডা। মানুষটাকে অদ্ভুত মনে হচ্ছে তার কাছে। যেন নিজেকে বসে রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না তার। এক্ষুণি ভেঙে পড়বে সমস্ত প্রতিরোধ। কাতর কণ্ঠে বলে উঠলে সে। 'দোহাই, আমার সর্বনাশ কোরো না। এ কি হচ্ছে আমার! এ কি ধাঁধায় ফেলে দিলে তুমি আমাকে।'

'ধাঁধা নয়। রোমান্স।' মৃদু হাসলো করিম আবার। 'আমি তোমাকে চাই। এবং এটা একটা বাস্তবতা। বুঝলে স্বর্ণ কুন্তলা?'

'ওহ্।' নিঃশ্বাস ফেললো লিন্‌ডা। এ ধরনের স্তাবকতার

পরেও সে প্রতিরোধ শক্তি হাতড়ে পাচ্ছে না নিজের ভেতর।
'তবে সব মুদ্রারই আবার একটা করে উল্টোপিঠ থাকে।' করিম বললো, 'একটি মধুর শীতল মুখের আড়ালেও লুকানো থাকতে পারে বৃশ্চিক।'
হঠাৎ উবু হয়ে লিণ্ডাকে চুমু খেলো করিম।
'বিব্রত হবার কিছু নেই।' সে বললো, 'তোমার কথা আলাদা।'
'উহ্! গণ্ডারের চামড়া আর কাকে বলে।'
'আর তুমি হচ্ছো রেশম, কোমল।' গভীর আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে করিম বললো, 'তুমি রাজি হয়ে যাও লক্ষীটি।'
'ন্-না।'
'বলো, বলো!' বলতে বলতে লিন্ডার বুকের বাঁ দিকে নিজের ডান হাতটা নিয়ে গেলো করিম। বাঁ দিককার স্তনটা উন্মুক্ত করলো আবরণী সরিয়ে। লিন্ডা ধ্বস্তাধস্তি শুরু করে দিলো এবার। হঠাৎ দেখলো, শান্ত চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে করিম। মনে হলো, তাকে নিয়ে খেলা করছে করিম। খেলা, সেই সঙ্গে খানিকটা জানান দেওয়াও। অর্থাৎ এখন, এখনই সেই মহেন্দ্রক্ষণ, যখন এই পাম গাছে সাজানো পথের ওপরই শুয়ে পড়তে হবে। কোনো রকম সম্ভ্রম বোধ কিংবা আনুষ্ঠানিকতার আদৌ প্রয়োজন নেই।
'পাজি, শয়তান—আমি রাজি!'
'বুয়েনো!' একটা জান্তব শব্দ করে লিন্ডাকে লুফে নিয়ে

শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে এনে আদিম চুম্বনে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো তার সমস্ত শরীর। পোশাকের ওপর দিয়েই সে চুমু খাচ্ছিলো ওকে পাগলের মতো। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে শব্দ করছিলো, 'মায়া জয়া, মায়া জয়া।'

'পাগল কোথাকার।' নিঃশ্বাস ফেলে বললো লিন্‌ডা।

'ঠিক পানকৌড়ির মতো, তাই না।' কোল থেকে নামিয়ে মাটিতে দাঁড় করালো সে লিণ্ডাকে। বললো, 'চলো আমার সংগে। তোমাকে ব্রেসলেট পরিয়ে দেবো।'

'আমার ব্রেসলেট আছে।'

'থাকতে পারে।' করিম বললো, 'কিন্তু বাগদত্তাকে ব্রেসলেট পরানো এদেশের প্রথা। তোমাদের দেশে যেমন আংটি। বুঝলে।'

'তুমি যেন একটু বেশি আরবীয়, তাই না আল খালিদ?' হেসে উঠলো করিম। 'তাই বুঝি ভয় পাচ্ছো, শিগগিরই হেরেমে বন্দী করে ফেলবো তোমাকে।'

'তুমি কি তা করতে যাচ্ছো না?'

'আমার যে কোনো মরু-নিবাসে গিয়ে ওঠা যাবে তোমাকে নিয়ে।' নিবিড়ভাবে দু'হাতে হাত রেখে বললো করিম। এই হাত দুটি এখন তার অধিকারে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ অধিকার অর্জন করেছে সে।

আর লিন্‌ডা? লিন্‌ডা লেনী।

সে যেন মানস নেত্রে দেখতে পেলো এক বিচিত্র দৃশ্য। আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিচ্ছদ পরে সে আর করিম আল খালিদ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে বিবাহ-মঞ্চের দিকে।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটা কেমন অবাস্তব, কেমন স্বপ্নের মতো মনে হলো তার কাছে।

মোঃ মোকসুজ্জামান মনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

৪

চমৎকার রেশমী পোষাকের ওপর আলতোভাবে আঙ্গুল বোলাচ্ছিলো লিন্‌ডা। কোটটা করিম নিজে পছন্দ করে কিনেছে। যেমন সে পছন্দ করেছে এটাও যে, লিন্‌ডা তাকে তার ডাকনাম ধরে ডাকবে। লিন্‌ডা ভাবতে গিয়েও শিউরে উঠলো বিস্ময়ে যে, ওরা প্লেনের ভেতরে বসে আছে। গন্তব্য ফেজ এলজিদ। করিম ওর পাশাপাশি নয়, মুখোমুখি বসেছে। কেননা বিমানটি তার নিজের।

করিম এখন আগের মতো চঞ্চল নয়। স্থির, গম্ভীর, অচঞ্চল। ছ'চোখ আধবোঁজা করে গভীরভাবে কি যেন সে চিন্তা করছে। পরণে তার ধুসর স্যুট। ওরা ছ'জন ফেজে যাচ্ছে? কেননা, সেখানেই বিয়েটা হবে তাদের। সেখানেই তারা পরিণত

হবে স্বামী-স্ত্রীতে। বার্সিলোনার সৌখিন দোকান থেকে মূল্যবান পোশাক আশাক কেনা হয়েছে প্রচুর। অন্যান্য জিনিষও অনেক। সেগুলো ডাঁই করে রাখা আছে প্লেনের ভেতরে। করিম যখন তার মহিলা-ম্যানেজারকে ফোন করে লিণ্ডার কয়েক প্রস্থ পোশাক বের করে রাখার অর্ডার দিলো বিস্মিত হয়েছিলো সে তখনই। সকাল, দুপুর, বিকেল এবং রাতের পোশাক। সেই সঙ্গে আলাদা আলাদা জুতো। আবার ঘোড়ায় চড়া এবং অবসর কাটানোর সময় ভিন্ন পোশাকের কথা বলে দিলো করিম।

'বড়ো ভাগ্যবতী বউ পাচ্ছেন আপনি।' বলেছিলো—মহিলা ম্যানেজার।

আর লিন্‌ডা ভাবছিলো অন্য কথা। ভাবছিলো করিম তাকে কিনে নিচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্যে আর চাকরি করতে হবেনা।

'ঠিক এমনটিই আমি চেয়েছিলাম।' বলে উঠলো করিম আল খালিদ। চোখ তার লিন্‌ডার মুখের দিকে।

'গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত দেখা যাচ্ছিলো তোমাকে।' স্মিত হেসে উচ্চারণ করলো লিন্‌ডা। 'কী ভাবছিলে এতো?'

'ছাখো লিন্‌ডা, আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি। এ সময় একটু হালকা চালের কথাবার্তাই ভালো। অতো গুরুগম্ভীর প্রশ্ন করছো কেন, বলতো?'

'বিয়ের পরেই হালকা হওয়া যায়। তার আগে নয়।' বললো

লিন্‌ডা।

'ফেজে গিয়ে বিয়ের ব্যাপারটা তোমার কাছে কেমন লাগছে? বেশ উত্তেজনাকর নয়?'

'সত্যি বলতে কি। উত্তেজনাকর শব্দটিও যথেষ্ট পানসে বলে মনে হচ্ছে যেন।'

'তুমি অসাধারণ সুন্দরী লিন্‌ডা। কিন্তু সাধারণ, সাদা মাটা পোশাক পরে বিপুল ঐশ্বর্যকে ঢাকা দিয়ে রাখাই ছিলো তোমার স্বভাব। তোমাকে আবিষ্কার করে নিজেকে পৃথিবীর ভাগ্যবান অভিযাত্রীদের একজন বলে মনে হচ্ছে আমার। যেন খনন কার্য চালিয়ে উদ্ধার করা গেছে এক অসাধারণ শিলাকর্ম।'

'বিয়ের অনুষ্ঠানটি কি খুব জটিল?'

'তোমার ভালো লাগবে।' করিম লাইটার জ্বেলে চুরুট ধরালো। 'তোমার বিব্রত হবার মতো কোনো কারণ সেখানে থাকবে না। কেবল একটি বার তোমাকে আরবী পোশাক পরতে হবে। তাতে কি খুব একটা অসুবিধা হবে তোমার?'

'বিলেতেও বিয়ের সময় কনেরা মস্ত লম্বা আলখাল্লা পরে। দুটোতে খুব বেশি তফাৎ আছে বলে মনে হচ্ছে না।' লিন্‌ডা আশ্বস্ত করলো করিমকে।

'কালকে একটা অ্যাঙ্কলেট দেবো তোমাকে। সোনার তৈরী। কাল এটাও তোমাকে পরতে হবে। আমাদের এখানকার নিয়ম। আশা করি মনে কিছু করবে না এজন্যে। আমার

কাছে অবশ্য খুব হাস্যকর বলে মনে হয়।'

লিণ্ডা একটু চিন্তিত হলো। এই লোকটার সংগে সে যা কিছু করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তার যথাযথ ধারনা আছে তো?

'প্রাচ্য দেশীয় পোশাক তুমিও কি কাল করবে?' লিণ্ডা শুধায়।

'অবশ্যই পরবো।' মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে ধোঁয়ার একটা রিং বানালো করিম। 'বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আমি আরব-শেখের পোশাক পরি। তুমি কি বুঝতে পারছো যে আমিও একজন শেখ?'

সে অনিশ্চয়তার সংগে হাসলো। বললো, 'কে ভেবেছিলো যে আমার মতো সামান্য এক ইংরেজ মেয়ের বিয়ে হবে এতো বড়ো পদবীধারী একজন পুরুষের সংগে? তা আমারও কি কোনো পদবী থাকবে?

'আমার বাড়ির লোকজন তোমাকে বলবে 'লেল্লাহ', যার অর্থ হচ্ছে লেডী। অর্থাৎ কিনা বেগম। কাল থেকেই তুমি বেগম সাহেবা।'

'ওহ।' বিড়বিড় করে বললো লিন্‌ডা। 'তুমি আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছো করিম। কিন্তু আমার সম্পর্কে তুমি তো কিছুই জানো না।'

'জানি। যা যা তোমার সম্পর্কে আমার জানা দরকার তার সবই জানি আমি।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে করিম বললো। যদি তুমি আমার চোখ দিয়ে তোমাকে দেখতে

তাহলে বুঝতে পারতে আমি কি বলতে চাই।'

'পালক দেখেই পাখি চেনা যায়।' লিন্‌ডা বললো, 'আমি জানি, আমি সুন্দরী নই। আমার নাকটা সামান্য বাঁকা। মুখটা বেশি চওড়া। আর আমার চুল কোনো দিনও লাতিন রমণীদের মতো ঘন ঘন কালো মায়াভরা নয়।'

'কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে তুমি একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় রমণী।' ওর পায়ের ওপর হাতের আঙুল দিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে করিম বললো। লিন্‌ডা শিউরে উঠলো সংগে সংগে। এই স্পর্শ সে সহ্য করতে পারেনা। মনে হয় পাগল হয়ে যাবে। মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে। করিমের সামান্য ছোঁয়ায় নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলে লিণ্ডা। কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ে।

'তোমার এই শরীর আমার দেহে জ্বালা ধরিয়ে দেয় লিন্‌ডা।' অনুচ্চ স্বরে করিম বললো, 'আমি কামনা করি তোমার সাদা চামড়ার প্রতিটি ইঞ্চি, প্রতিটি সোনালী চুল। নাড়ির প্রতিটি স্পন্দন। মনে হয়, এখন আর পরস্পরকে স্পর্শ করার সময় একে অন্যকে আগন্তুক ভাবাটা ঠিক হবে না।'

সত্যিই কি তাই? লিণ্ডা কথাটা নিয়ে মনের ভিতর নাড়াচাড়া করতে লাগলো। ইতিমধ্যে স্টুয়ার্ড এসে লাঞ্চ দেবে কিনা জানতে চাইছে। নিজের আসনে হেলান দিয়ে বসে নানা-কথা ভাবতে থাকলো লিন্‌ডা।

'অরেঞ্জ জুসের সঙ্গে চিল্‌ড শ্যাম্পেন চলবে তো লেল্লাহ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে।' জবাব দিলো লিন্‌ডা।

'আমাকে একটা মলট্‌ হুইস্কি,' করিম বললো স্টুয়ার্ডকে। স্টুয়ার্ড সশ্রদ্ধে অভিবাদন জানিয়ে কার্পেট মাড়িয়ে চলে গেলো প্যান্ট্রির দিকে।

'মনে হচ্ছে তুমি একটা গোঁড়া আরব নও।' মন্তব্য করলো লিণ্ড।

মাথা ঝাঁকালো করিম। বললো, 'পাপী, কিংবা পুণ্যবান, এ দুটোর কোনোটাই আমি হতে চাইনি। আমি চিরদিনই নিজেকে ভাবতে চাই একজন সাধারণ মানুষ বলে।'

লিন্‌ডা মনে মনে ভাবলো, করিম এমন একজন মানুষ, কেউ কখনো যার হৃদয় মুচ্‌ড়ে দেয়নি। যে পুরুষ রমনীকে দিতে পারে বিপুল আনন্দ। আবার তীব্র দুঃখও।

'তুমি যখন চুপচাপ বসে ছিলো আমি লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। মনে হয়, আমি যা দিতে বলেছি তা খেতে তোমার খুব একটা খারাপ লাগবে না।' বলতে বলতে লিন্‌ডার মাথার ওপর থেকে দামী টুপিটা খোঁচা দিয়ে ফেলে দিলো করিম।

'অমন সুন্দর টুপিটা নষ্ট হয়ে যাবে যে!' বললো লিন্‌ডা।

'তোমার সুন্দর চুলগুলোকে ঢেকে রেখেছে ওই বিচ্ছিরি টুপিটা। তাই ফেলে দিলাম।'

ডোরিস চাচী এ অবস্থায় ওকে দেখলে কী ভাবতেন, কে জানে। হয়তো বা মুর্ছাই যেতেন। বার্সিলোনা থেকেই অবশ্য তার কাছে সবকথা জানিয়ে চিঠি লিখেছে সে। সে

চিঠি হাতে পেয়ে চাচীর কী অবস্থা হয়েছে, কে বলবে।
'তোমার মতো একটি মেয়ে আমি কখনো দেখিনি!'
'এ বয়েসে অনেক মেয়ে দেখেছো বুঝি?
'হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি!' করিম বললো, 'কিন্তু আনন্দ থেকে অনেক দূরে, অন্য রকম হাজারো ঝামেলায় ডুবে থাকি আমি। তুমি কী ভাবতে পারো, আমার মরুভবনগুলোয় কতো পরী ঘোরাফেরা করে? আমি কখন তাদের দর্শন দিয়ে ধন্য করবো, সেজন্যে তারা পটের বিবি সেজে বসে থাকে দিনের পর দিন।'
'আমার ধারনা, তুমি যাওনা!'
'তুমি কি আমার এক মাত্র নারী হতে চাও?'
মাথা নাড়লো লিণ্ডা। বললো, 'করিম, সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই না। আমরা এখনো পরস্পর থেকে এতো বেশি রকম আলাদা, অচেনা?'
'কতো রকম, তা অবশ্য গোনা যায়না।' লিণ্ডার কাছ থেকে যেন সম্মতি আদায় করতে চাইছে করিম। বললো, 'আমরা যদি সুখ স্বচ্ছদের জন্যে চ্যাঁচাতে থাকি, দু'জনের কেউই তা এক্ষুণি পাবনা। বুঝলে?'
একথা মিথ্যে যে নয়, লিণ্ডা তা বুঝতে পারে।
'মনে হয়, বয়েস বাড়লেও, মনটা সেরকম বাড়েনি তোমার। তাই না?' জিজ্ঞেস করে করিম। বলে, 'তোমার অপরিণত পাখা জোড়া যাতে না-ভাঙ্গে, আমি সে দিকে কড়া নজর

রাখবো।'

লিণ্ডা শ্যাম্পেনের গ্লাসে আলতো চুমুক দিলো। তার মনের মধ্যে নানা ভাবনার ঘূর্ণিপাক। অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে সে ফেঁজ যাচ্ছে। এমন একটা দেশে তাদের বিয়ে হচ্ছে যেখানে স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের ভোগের সামগ্রী। দখলীকৃত সম্পত্তি। বোধ-হয় পুত্রসন্তান প্রার্থী এক উন্মাদের বন্দীশালাতেই তাকে জীবন কাটাতে হবে। বুকের ভেতর মুচড়ে উঠলো লিণ্ডার।

'কী ব্যাপার? তোমার পায়ে পা ঠুকে যাবে যে।' বিস্ময় প্রকাশ করে করিম। 'পা নড়ছে না, ভীত বেড়ালের লেজ নড়ছে?' জিজ্ঞেস করে সে। 'রিল্যাক্স্ করতে শেখো। এতো শিখতেই হবে তোমাকে।'

'সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কিংবা পরীক্ষার সময়ও আমার এরকম হতো।' ঘাবড়ে যাওয়া হাসি হাসলো লিণ্ডা। 'যা ভয় পেতাম! মনে হতো, নোটেশন গুলিয়ে ফেলবো।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই মায়া লিন্দো!'

'বড়ো ভয় হয় করিম।'

'মোটেই ভয় পাবে না।' গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়ে এক চুমুক মল্ট হুইস্কি খেলো করিম। 'তুমি কতোটা স্পর্শ-কাতর আমি তা মেনে নিতে ভালোবাসি, বুঝলে?'

দুজন দুজনের চোখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকলো কিছুটা সময়। লিণ্ডা এক সময় নামিয়ে ফেললো নিজের দৃষ্টি। তারপর চোখ তুলে বললো, 'কেন জানি মনে হয়, তুমি

আমাকে কিনে নিচ্ছো ?'

কাঁধে সামান্য ঝাঁকি দিয়ে করিম বললো, 'তা যদি মনে করো - করবো। আমি যা বুঝি তাহলো, তুমি আমার বউ হতে যাচ্ছো। আর আমি তোমার স্বামী। ব্যস কথা শেষ।'

'স্প্যানিশ রক্ত শরীরে আছে, এরকম একজন প্রতাপশালী আরবের মতোই শোনাচ্ছে তোমার কথাগুলো।'

'আর সেই দুশ্চিন্তায় তোমার ঘুম হচ্ছে না, তাই না।'

'আমি শুনেছি এই ধরনের লোকেরা স্ত্রী রাখে না, রক্ষিতা পোষে।'

'কথাটা ঠিক তা নয়। খানিকটা অন্যরকম। কেউ কেউ তাদের স্বাভাবিক সংসারের আড়ালে বুনো মোষ পোষার মতো বন্য যৌনতাসম্পন্না মেয়ে মানুষ রাখে। তেজ কমে এসেছে, এরকম পুরুষরাই অবশ্য এই প্রবনতার শিকার হয় বেশি।'

'তোমার মরুভবনটি কি খুব বড়ো? তার মানে ওই এককালের সেবাসদনটি।'

'মোটামুটি।' করিম জবাব দিলো, 'প্রচুর ফুলের ছড়াছড়ি দেখবে সারা বাড়িতে। সুঘ্রাণে ভরে যাবে মন। জায়গাটা আমি ভালোবাসি। কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারিনা। রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে ক্যাষ্টিলোতেই ডেরা বাঁধতে হয়েছে স্থায়ীভাবে। কাজেকর্মে

ওখানেই বেশী সুবিধা আমার। দোনা দোমায়ার মতো আরো কতো নির্যাতিতো অসহায়া রমণী আসে শরনার্থী হয়ে। ক্যাস্টিলোতে আমি না থাকলে,তাদের আশ্রয় দেবে কে? দোনো দোমায়ার অসুখ খুব সহজে সারবে বলে মনে হয়না। কেননা অসুখটা কেবল তার দেহে নয়, মনেও। জানো, সে এখনো মনে করে তার স্বামী লুইস এখনো মারা যায়নি। এখনো সে বেঁচে আছে। সত্যটাকে যে পর্যন্ত তাকে বিশ্বাস করানো না যাবে, ততোক্ষণ তার আরোগ্য লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই।'

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে করিম বললো, 'ফেজে গিয়ে অবশ্য সমস্যার কথা ভুলে যেতে হবে আমাদের দুজনকেই। তখন কেবল আমি আর তুমি। তুমি আর আমি। বুঝতে পেরেছো।'

লিণ্ডা সম্মতিসূচক ভাবে হাসলো। ফেজে গিয়েই অতীতের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে লিণ্ডার। সামনে তখন থাকবে কেবল আগামীকাল। থাকবে ভবিষ্যত। কী আছে সেই ভবিষ্যতের গর্ভে? কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর।

সুস্বাদু ও মহার্ঘ খাদ্য আর পানীয় শেষ হলে করিম লিণ্ডাকে জানালো, বাড়ির মূল অভ্যর্থনা কক্ষে তাদের বিবাহ-বেদী তৈরী করতে বলা হয়েছে। সেখানে মোজাইক করা মেঝে, মাঝখানে রয়েছে ফোয়ারা। দারুণ পরিবেশ। লিণ্ডার খুবই ভালো লাগবে ওবাড়িতে। মরুভূমির শূন্যতা

দেখে হতাশ হবার কিছু নেই। মাঝে মাঝে রয়েছে শান্তিময় মরুদ্যান। সবুজের সমরোহ। রাত্রে যখন অন্ধকার নেমে আসে, যখন আকাশে ঝলমল করতে থাকে রাশি রাশি নক্ষত্র, তখন স্বপ্নময় শীতল হাওয়ায় মরুভূমি পূর্ণ হয়ে যায়। এ যেন আল্লাহর বাগান।

করিম জানালায় আঙুল ঠেকিয়ে বললো, 'ওই তো, নিচে শেষ হয়ে গেলো আমাদের স্প্যানিশ এলাকা। এর পর থেকেই শুরু হলো আরবীয় চৌহদ্দি।' লিণ্ডার মনে হলো, করিমও যেন বদলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ফেজ এসদিজের দিকে প্লেন যতোই এগিয়ে যাচ্ছিলো, তাতেই মনে হচ্ছিলো, পাল্টে যাচ্ছে ওপাশের মানুষটাও। জেগে উঠেছে তার আরব-সত্ত্বা। সে এখন আদিম রিপু সর্বস্ব এক রণোন্মাদ এক আশ্চর্য দেশের বিচিত্র সন্তান। শেখ করিম আল খালিদ, এখন তার নাম। এ দেশ মক্তবের দেশ। হারেমের দেশ, যে হারেমে গৃহস্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রবেশ নিষেধ। এখানে রাস্তায় নেমে বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে চলতে হয় মেয়েদের। যাতে শয়তানের নজর না পড়ে তাদের সোনার শরীরে।

প্লেন ভূমতে নামছে। লিণ্ডা খানিকটা আশ্বস্ত হলো এই ভেবে যে করিম তাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দুশ্চিন্তা হলো, সত্যিই তাকে হেরেমে বন্দী হয়ে থাকতে হবে কিনা। হলেই বা কতোদিন থাকতে হবে সেখানে।

তাদের এই বিয়ে টিকবেই বা কতদিন? একটি সন্তানের জন্ম-গ্রহণ? কে জানে!

প্লেনের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে মনিবন্ধের ব্রেসলেটে ঠিকরে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চায় যেন। করিম নিজের হাতে ব্রেসলেটটা পরিয়ে দিয়েছে তাকে। অন্য হাতে রয়েছে ওর নিজের ব্রেসলেট। যার মাঝখানে উৎকীর্ণ আছে ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ড। দেখলেই মায়ের মুখটা মনে পড়ে যায় লিণ্ডার। যখনই কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে খোদাই করা হৃদপিণ্ডটা স্পর্শ করেছে লিণ্ডা। যেন মায়ের আশীর্বাদ লেগে আছে এই পুরোনো বালাটির মধ্যে। এটা স্পর্শ করলেই আর কোনো অশুভ প্রভাব কার্যকর হবে না। কিন্তু কেন এমন ভেবেছে তারও কোনো সদুত্তর মেলেনি। মায়ের সঙ্গে তো তার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো না। স্বামী এবং শিশু সন্তানকে ফেলে রেখে অন্য লোকের হাত ধরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। বাবাও তাকে তুলে দিয়েছিলো চাচা-চাচীর হাতে। কাজেই মা-বাবার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কের কল্পনা করাও তো হাস্যকর!

লিণ্ডা তো তাই স্বপ্ন দেখেছে ফুটফুটে এক সন্তানের। তার গর্ভে যার জন্ম হবে। সে হবে করিমের ঔরসজাত এক আনন্দময় শিশু। যার চারদিকে থাকবে হাসি-খুশি আর ভালোবাসা। যার জন্যে সাজানো হবে মনোরম এক খেলাঘর। যেখানে শোনা যাবে কচি কণ্ঠের মায়াভরা কল-

কাকলী। যেখানে মেঝের ওপর ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকবে সুগন্ধি কেকের অজস্র টুকরো। এটা কোরো না, ওটা কোরোনা বলে ডোরিস চাচীর মতো কোনো গোমড়ামুখো মানুষ সেই শিশুকে যেখানে নিয়মসিদ্ধ একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত করবে না।

'চুপ করে আছো যে!' করিমের গলা শোনা গেলো—'মাটির পৃথিবীতে নেমে আসার ভয়ে কাতর হয়ে পড়লে নাকি?'

'ছলে বেলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো হঠাৎ।' বললো লিণ্ডা। 'আচ্ছা করিম, আমার যদি একটা বাচ্চা হয়, তো আমার কাছেই থাকবে। আমিই তাকে মানুষ করবো। তাই না?'

'অবশ্যই!' করিম বলে উঠলো। 'আমি অতোটা নিষ্ঠুর নই যে, মায়ের বুক থেকে সরিয়ে রাখবো তার সন্তানকে।'

'শপথ করে বলো করিম।' লিণ্ডা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললো। 'আমাকে তুমি কথা দাও।'

'কথা দিলাম।' করিম বললো, 'এতো আমি আগেই ভেবে রেখেছি। এ নিয়ে তোমার এতো উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। তুমিই তো হবে সত্যিকারের মা।'

'আমি চেষ্টা করবো করিম।' দু'চোখে পানি এসে গেলো হঠাৎ লিণ্ডার।

'ওরে আমার বউ রে, এ নিয়ে এতো চিন্তা করার কি আছে, অ্যাঁ।' লিণ্ডার হাত ধরে করিম তাকে আশ্বাস দিতে থাকে।

'সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ব্যক্তিগত এয়ার ষ্ট্রিপে প্লেন থেকে নেমেই অপেক্ষমান লিমুজিনে উঠে বসে লিণ্ডা আর করিম। গাড়িটা আগে থেকেই ওখানে অপেক্ষা করছিলো ওদের জন্যে। ফেজ শহরের শেষ প্রান্তেই শুরু হয়েছে মরু এলাকা। শহর আর মরুভূমির ঠিক মাঝা-মাঝি জায়গায় করিম আল খালিদের মরুভবন। গাড়িটা দেয়াল দেয়া রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে। লিণ্ডার মনটা কেবল ছটফট করছে করিমের একটুখানি আদর পাবার জন্যে। কিন্তু বিচিত্র নগরীর প্রকাশ্য জনসমাবেশে এটা তো সম্ভব নয়। এটা বিলেত নয়। প্রাচ্য দেশীয় রক্ষণশীল শহর। প্রকাশ্য আলিঙ্গন আর চুম্বন ইউরোপের কোনো শহরে সম্ভব হলেও, এখানে ভাবাও যায় না। লিণ্ডা লক্ষ্য করলো, করিম তার থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে বসে আছে। তার চোখ মুখে আঁকা আছে এক ধরনের নির্লিপ্ত। ব্যাপারটা আহত করলো লিণ্ডাকে।

অদ্ভুত শহর এই ফেজ। যান বাহনের মাঝখান দিয়ে দিব্যি চলাফেরা করছে ভারবাহী গাধাগুলো। লিন্‌ডা ধূসর ইমারত, দীর্ঘ মিনার ও গোল গম্বুজ শোভিত ফেজ নগরীর বৈচিত্র-ময় রূপ দেখে আকৃষ্ট হলো। রাস্তায় কুকুরও আছে অনেক। কালো বোরখা পরা মেয়েরা চলাচল করছে সতর্কতায় সঙ্গে। এমন প্রাচীণ, এমন থমথমে চেহারার শহরও যে পৃথিবীতে থাকতে পারে, লিন্‌ডা তা কখনো ভাবেনি। হাজার বছরের

পুরনো শহর নাকি ?—'অবশ্য লিন্‌ডা শহরটার বয়েস শুনেছে। অতো পুরনো নয়।

দেখতে দেখতেই পুরনো শহর পেছনে পড়ে গেলো ওদের। সামনে নতুন ঝকঝকে এলাকায় পৌঁছে ধারনা বদলে গেলো লিন্‌ডার। চওড়া রাস্তায় দু'ধার দিয়ে সার সার হাল-ফ্যাশনের বাড়ি। সু সজ্জিত বাগান, সুদৃশ্য ফোয়ারা, কি নেই সেখানে। মেয়েরাও সেখানে কালো বোরখায় শরীর ঢেকে রাখেনি। একটি বাড়ির ব্যালকনিতে দেখা গেলো আধুনিকা রমনীকে। তার কানের রিং সূর্যালোকে জ্বলছে নক্ষত্রের দ্যুতি ছড়িয়ে। মেয়েটির গায়ের রঙ ঠিক কাঁচা সোনার মতো। কোত্থেকে একটা ফুটফুটে বাচ্চা দৌড়ে এলো তার কাছে। ওরই সন্তান হবে নিশ্চয়। মেয়েটা দু'হাতে বুকে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তুললো ওই দেবো পম শিশুটির মুখ। লিণ্ডার মনটা ভরে গেলো নির্মল আনন্দে।

'দু'একদিনের মধ্যেই আমরা বাজার দেখতে যাবো। অদ্ভুত জায়গা। বিচিত্র জন-সমাবেশ।' করিম বললো, 'তোমার খুবই ভালো লাগবে। গোলমাল সত্ত্বেও।'

'নিশ্চয়ই বেড়াতে আসবো।' লিণ্ডা খুশি খুশি গলায় বলে, 'খুবই পুরোনো শহর এটা, তাই না ?'

'মরক্কোর সবচাইতে পুরনো শহর এটি। বিশুদ্ধ প্রাচ্য দেশীয় নগরী। সময় এখানে সচল নয়। মুয়াজ্জিনের গলার

আওয়াজে তার অস্তিত্ব আঁচ করা যায় চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচবার মাত্র।' করিম আস্তে আস্তে বলে, 'আমার বাবা এই শহরেই জন্মেছিলেন। অবশ্য যে প্রাচীন প্রাসাদে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তা ধুলোয় মিশে গেছে। তাও অনেক দিন আগে।'

কেমন বিষণ্ণ মনে হলো করিমের কথাগুলোকে। লিণ্ডার ইচ্ছে হলো, সরে গিয়ে সহানুভূতি জানায় ওর পিঠের ওপর হাত রেখে। এই সহানুভূতির কারণটাই বা কি? দুজনের ছেলে-বেলাই খুব নিঃসঙ্গ কেটে গেছে বলে? হঠাৎ সূর্যটা ডুবে গেলো পশ্চিমাকাশে। পাতলা এক খানা চাঁদ দেখা গেলো আবছা আকাশে। যেন আরব দেশীয় ছুরির ফলা। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল মিনার দেখতে পেলো লিণ্ডা। এই সেই বাড়ি। শ্বাস পড়লো তার। এই বাড়িতেই তার বিয়ে হবে শিগগীরই। গাড়ি থেকে নামতেই বিশাল প্রাঙ্গন। সান বাঁধানো। চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। অজানা ফুলের ঘ্রাণ পেলো লিণ্ডা।

'গন্ধটা কোন্ ফুলের?' শুধায় সে।

'জেসমিনের।' করিম উত্তর দেয়।

কথা বলতে বলতে ওরা মূরীয়-স্থাপত্য-নির্দশন, বিশাল তোরণটার দিকে এগিয়ে যায়। দেয়ালগুলো ছেয়ে আছে হাল্কা হলুদ অজস্র ফুলে। পাথরের দেয়ালগুলো ওই নরম ফুলের স্পর্শে যেন নম্রতায় ভরে উঠেছে। দেখেই

দুচোখ জুড়িয়ে যায় লিণ্ডার।

'কী সুন্দর, তাই না!' কলকলিয়ে উঠে সে খুশিতে।

জবাবে মাথা নাড়ে করিম। আস্তে আস্তে বলে, 'আমাদের স্মৃতির খাতায় মুহূর্তটির কথা লিখে রাখতে হবে লিণ্ডা। আকাশে আশ্চর্য চাঁদ। চারদিকে অতুলনীয় ফুল। তার মাঝখানে অনন্যা তুমি! জানিনা, আজ তোমাকে এতো বেশী ভালো লাগছে কেন? আমিও তো মানুষ। আজ আমি কি ভাবে প্রতিজ্ঞা করবো, যে তোমাকে কখনও আঘাত দেবো না? সেই শপথ যদি রক্ষা করতে না পারি?'

'তুমি অন্যদের মতো কখনো নও করিম। তুমি অনেক আলাদা! তুমি যেরকমই হওনা কেন, কঠোরে আর কোমলে মেশা তোমার চমকপ্রদ চরিত্রের খানিকটা পরিচয় এর মধ্যেই পেয়ে গেছি আমি। করিম আল খালিদ একজন সাধারণ মানুষের মতো আচারণ করছে, এ তো আমি ভাবতেই পারিনা।'

'তোমার কথাই বা কি বলবো লিণ্ডা। দুনিয়ার মানুষ তো আর কম দেখিনি। কিন্তু তোমার মতো স্পর্শ কাতর প্রাণী আর একটিও নজরে পড়েনি আমার। তোমাকে নিয়ে তাই তো আমার ভয়।' বললো করিম।

'তা ঠিক। খুব সহজেই আমি দুঃখ পেয়ে যেতে পারি।' লিণ্ডার মনে পড়ে, স্কুলের শিক্ষক তাকে স্বপ্ন বিলাসী বলে অপবাদ দিয়েছিলেন ছোট বেলাতেই। শব্দটার মানেও সে

জানতো না তখন। স্কুল রিপোর্টে তাঁরা আরো লিখেছিলেন, পড়া-শোনায় এ মেয়ের কোনো মনোযোগ নেই। সব সময় বসবাস করছে যেন সে আপন ভুবনে। রিপোর্ট দেখে ডোরিস চাচীর সে কি রাগ? অবশ্য চাচা খানিকটা বুঝতে পেরেছিলো ওকে। চাচাই তাকে উৎসাহ দিয়ে গানের ইশকুলে ভর্তি করে দেয়।

করিম গলার উপর হাত বুলোয় লিণ্ডার। বলে, 'যদি তুমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারতে, আমি তোমাকে পাবার জন্যে কতোটা কাতর? কেউ যদি আমার সামনে এসে এখন বলে, লিণ্ডাকে তুমি পাবে না! সঙ্গে সঙ্গে তার গলা টিপে ধরবো আমি।'

'পাজি, বর্বর কোথাকার!' দুষ্টুমি করে গালি দেয় লিণ্ডা। 'বিয়ের আগেই মালিকানা? অতো সোজা নয়, জনাব।' লিণ্ডা হাসতে থাকে। তার সঙ্গে যোগ দেয় করিমও। দু'জনের দু'রকম গলার হাসির শব্দে পাষান--চত্বরটিও হয় ওঠে প্রসন্ন। প্রাসাদের ভেতরে ঢুকেই বিয়ে যে ঘরে হবে, সেই ঘরটা দেখতে চাইলো লিণ্ডা। করিম ওর হাত ধরে সেখানে নিয়ে গেলো। এরকম সুন্দর একটি কক্ষ কেবল স্বপ্নেই বুঝি দেখা যায়। মায়াবী আলোয় স্নিগ্ধ হয়ে আছে ঝকঝকে ঘরটা। চিকচিক করছে মোজাইকের মেঝে। ফোয়ারা থেকে পানি উঠছে শূন্যে। প্রাচ্যবাসীরা গৃহে কেন শোলার চটি প্যুয়ে দেয়, তা যেন আজকেই প্রথম বুঝতে পারছে লিণ্ডা।

'দারুন সুন্দর।' লিণ্ডা অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, 'এই সৌন্দর্য নিজেকে আরো বেশি করে ইংরেজ ভাবতে সাহায্য করছে।'
'ঠিক বলেছো। এই পরিবেশে তোমাকে আরো অনেক বেশি ইংরেজ মনে হচ্ছে।' বলতে বলতে লিণ্ডার হাত ধরলো করিম। ওর আঙুলগুলো নিজের আঙুলের ফাঁকে রেখে করিম বললো, 'অনেকে দেখেছো। এখন নিজের ঘরে চলো। পোসলটা সেরে নিলে খাবার টেবিলে আরাম পাবে।
ওহ, কী বিশাল বাড়ি! লিণ্ডা ভাবলো, এরকম একটা নতুন জীবন যে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলো, কে তা জানতো।

৫

'রাস ব্লাংকা' মূলত একটি উদ্যান-বাটিকা। এ বাড়ির বেশির ভাগ কর্মচারী হচ্ছে পুরুষ। যাদের পরনে ধবধবে সাদা টিউনিক জাতীয় পোশাক, মাথায় পাগড়ি। কাজের মেয়ে মাত্র দু'জন। এবং এই দু'জনই পরিচারিকা নির্বাচিত হয়েছে লিণ্ডার। খাস-চাকরানী যাকে বলে। সোফিয়ার ওপর তার পোশাক পরিচ্ছদের দায়িত্ব। পারভীন করবে তার কেশ-পরিচর্যা। পোশাক পরার সময় লিণ্ডাকে সে সাহায্য সহায়তাও করবে।

অন্য কোনো অসুবিধা নেই, তবে এদের সঙ্গে ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। দু'জনের একজনও ইংরেজি জানেনা। প্রথমে তো এদেরকে বোবা বলেই মনে করেছিলো লিণ্ডা। বাক্স-প্যাটরা গোছগাছ করবার সময়ই সোফিয়ার গলার আওয়াজ প্রথম শোনে সে। লিণ্ডার নতুন নতুন পোশাক দেখে সে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো। খাস স্প্যানিশে সে বলতে শুরু করেছিলো যে, আইবিজায় তার আত্মীয় আছে। তাদের 'তাবেরনা' অর্থাৎ হোটেলে সে কিছুদিন কাজ করেছে। ফেজে এসেছে বিয়ে করতে। বিয়ে হয়ে গেছে। তার স্বামী সরকারী চাকরী করে। কর্মস্থল দূরে থাকলে স্বামীরা স্ত্রীদেরকে ভালো পরিবারে কাজ করতে দেয়।

'তোমার বরটি তো বেশ আধুনিক ভাবধারার মানুষ?' লিন্ডা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে।

'কোনো কোনো ব্যাপারে!' মুখ টিপে হাসলো সোফিয়া। 'তা, এবাড়িতে কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে। পরার জন্যে লেল্লাহ্-র কতো কাপড়— বাব্বহ্ ভাবাও যায়না! আমাদের শেখ আল খালিদ তো মস্ত মানী মানুষ। যুদ্ধজয়ী বীর।'

কাটা কাটা কথা। কিন্তু কথাগুলো শুনে শিহরিত হয় লিণ্ডা। আনন্দ-শিহরণ অনুভব করে সে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এতোটা অল্প বয়েসেই আল খালিদ একাধিক কৃতিত্ব পূর্ণ কাজ

করে খ্যাতি অর্জন করেছে বলে গর্বের যেন শেষ থাকেনা তারও।

'শেখ সাহেব বিয়ের দিন আমাকে প্রাচ্যদেশীয় পোশাক পরতে বলেছেন। কী ধরনের পোশাক সেগুলো সোফি?'

'সপ্তাহখানেক আগে আমার কাছে ওই পোশাকের হুকুম এসেছে লেল্লাহ। আমি ওটা সেলাই করেছি।' ওয়ার্ডরোবের কারুকাজ করা পাল্লা খুলে দেখালো সোফিয়া। তাকের ওপর সাজানো আছে অত্যন্ত জেল্লাদার বিয়ের পোশাক। সোনার সূতো লতাপাতার মতো একেবেঁকে গেছে সেই পোশাকের ভিতর দিয়ে। কোথাও বা ঝলমল করছে মুক্তোদানা। জাঁকজমকপূর্ণ এই বিয়ের পোশাক দেখে চোখ ঝলসে যায় লিণ্ডার।

'পছন্দ হয়েছে আপনার?'

'এতো চমৎকার সেলাইয়ের হাত তোমার? সাটিনের কাপড়ের মধ্যে এমন সুন্দর কাজ করেছো!'

'আরবের মেয়েরা কম বয়সেই সেলাই করতে শেখে লেল্লাহ।' সোফিয়ার হরিনীর চোখের মতো সুন্দর চোখ জোড়া উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লেল্লাহর প্রশংসায়। 'আমার বিয়ের পোশাক তো আমিই সেলাই করেছি।' বললো সে। তাছাড়া আমার সবগুলো বিছানার চাদর, আমার স্বামীর আধা ডজন শার্ট। তা, আপনাদের ইংল্যাণ্ডে কনেরা এসব করেনা?'

'করতো। তবে আমার বিশ্বাস বহু বছর আগে।' লিণ্ডা

শার্টিনের পোশাকের ওপর আলতো আঙুলে টোকা দেয়। ঠিক যেরকম তার গায়ের চামড়ায় টোকা দিয়ে দেখে করিম আল খালিদ। বলে, 'তা এই পোশাকের সঙ্গে একটা বোরখাও তো থাকবে, তাই না?'

'বোরখা তো অবশ্যই আপনাকে পরতে হবে লেল্লাহ।' বলতে বলতে সোফিয়া ওয়ার্ডরোবের একটি ড্রয়ার থেকে বের করে আনলো বিশাল একটি বোরখা। দেখে লিণ্ডা তো একেবারে তাজ্জব। সে না হেসে থাকতে পারলো না।

'এই বোরখার অর্থ আছে।' গম্ভীর গলায় বললো সোফিয়া। 'সম্পূর্ণ একান্তভাবে পাওয়ার আগে বর আপনার মুখ পর্যন্ত দেখতে পারবেন না।'

'তাই নাকি? বাহ্!' লিণ্ডা মজা পেয়ে বলে উঠলো, 'তার মানে, কনে হচ্ছেন একটি উপহারের প্যাকেট যার মোড়ক খুলবেন বর!'

সোফিয়া এমনভাবে তাকালো, যাতে বোঝাই যায়, সে বিব্রত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে লিণ্ডা বললো, 'আমার বিয়ের পোশাক দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। পোশাকের রঙের ব্যাপারটা কি তোমাকে বলে দেয়া হয়েছিলো?'

সোফিয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। পোশাকটা ওয়ার্ড-রোবে তুলে রাখতে রাখতে সে বললো, 'মহামান্য হুজুর এ ব্যাপারে প্রথম খবর পাঠান হোসাইনের কাছে। হোসাইনই এ বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা করে। যাই হোক, সে-ই

আমাকে বাজারে পাঠায় কেনাকাটা করতে। সবচেয়ে দামী শার্টিন, সাদা আচকান, পাগড়ি, পায়ের চপ্পল সবকিছু আমি নিজে কিনেছি।'

'একবার পরে দেখবো নাকি!' কৌতূহলবশত লিণ্ডা বলে। নরম গদি লাগানো লম্বা টুলের ওপর বসে পড়ে সে। পা থেকে খুলে ফ্যালে জুতো জোড়া। পরে নেয় সোনালী বনাত লাগানো ভেলভেটের স্লিপার জোড়া। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়, আরব্য উপন্যাসে আঁকা একটি ছবি হয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করছে সে। বইটা একসময় সত্যিই তার ছিলো। মা কিনে দিয়েছিলো। কিন্তু পরে ডোরিস চাচীর বাড়িতে গিয়ে উঠলে, সে 'বাজে বই' বলে সরিয়ে ফেলে। বকবক করে সে আরো বলেছিলো, ছোটরা কখনো এসব উদ্ভট গল্প পড়ে নাকি? তাদের ভালো ভালো সব ক্লাসিক পড়া উচিত। হেনরী চাচার সংগ্রহে ছিলো ক্লাসিকের সম্পূর্ণ সেটটি। মজবুত আলমারিতে কাচের আড়ালে ঝকমক করতো সেগুলো। সেখান থেকেই ভ্যানিটি ফেয়ার, দ্য ওল্ড কিউরিওসিটি শপ আর মিল অন্য দ্য ফ্লস পড়েছিলো সে। ওহ্, সেদিনটার কথা কি কোনোদিন ভুলতে পারবে লিণ্ডা। যেদিন প্রথম পড়ার অনুমতি পেলো জেন অস্টিনের উপন্যাস!'

শৈশব স্মৃতির আবেশ নিয়ে লিণ্ডা হাঁটাহাঁটি করতে লাগলো বেডরুমের ভেতর। আঁটসাট স্লিপার পায়ে দিয়ে তার ফোস্কা পড়ে গেছে। গোড়ালিটা টন টন করছে সেজন্যে।

'আপনার কি হয়েছে লেল্লাহ?' মুখখানা অমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন? চিন্তিত গলায় সোফিয়া বললো।

'জুতো জোড়াটা মনে হয় ছোট হয়ে গেছে, সোফি।' সোফিয়া আর্তনাদ করে ওঠার আগেই লিণ্ডা তাকে ভরসা দিল যে, এ নিয়ে দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। বিয়ের দিন সে অন্য একজোড়া জুতো পরবে। লম্বা পোশাকের নিচে সে কোন্ জুতো পায়ে দিয়েছে, কেউ খেয়ালও করবেনা।

হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচে গেলো সোফিয়া। এমন সময় পারভীনকে দেখা গেলো। লিণ্ডার সামনে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে জানালো যে, গোসলখানায় সবকিছু তৈরি। লেল্লাহ এখন ইচ্ছে করলে স্নান করতে যেতে পারেন।

স্নানের পর আর এক প্রস্থ পোশাক পরে লিণ্ডা এলো কৃত্রিম সরোবরের ধারে। সেখানে ধবধবে সাদা ইউনিফর্ম পরে সোনালী রঙের মাছগুলোকে খেতে দিচ্ছিলো এক কিশোর ভৃত্য। মার্বেল পাথরের মেঝেয় তৈরী চৌবাচ্চায় বড়ো বড়ো শ্বেত পদ্ম ফুটে চারদিক আলো করে রেখেছে একেবারে। লিণ্ডাকে দেখে প্রথমে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিলো সে লজ্জায়। লিণ্ডা মৃদু হাসতেই মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালো ছেলেটি। তারপর খাবার ছুঁড়ে দিতে লাগলো গোল্ড-ফিশগুলোকে লক্ষ্য করে।

সাদা পোশাক পরা দু'জন আজ্ঞাবহ দাঁড়িয়ে আছে 'সালা'র সামনে। সেখানে সাদা ডিনার জ্যাকেট গায়ে অপেক্ষা করছে

করিম। তার জ্যাকেটের নিচে সাদা শার্ট। পরণে ম্যাট-ব্ল্যাক ট্রাউজার্স। লিণ্ডাকে দেখেই সে উঠে এসে তার হাত ধরলো। তারপর অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চললো তাকে।

'জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ঠিক যেন আরব্য উপন্যাসের সেই ধনাগারে ঢুকে পড়েছি আমি। আরব্য উপন্যাস বইটা এক সময় আমার ছিলো। তাতে ছিলো হারুনুর রশীদের গল্প। তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক রাজপুত্র।'

'আমাকেও তোমার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ বলে মনে হয়?' করিম স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করলো।

'খানিকটা তো বটেই।' করিমের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লিণ্ডা। হাল ফ্যাশানের পোশাকটি ছাড়া যাকে এখন পুরোপুরিভাবে মনে হচ্ছে প্রাচ্যদেশীয় এক রাজকুমার বলে। বিচিত্র ধরণের কক্ষ, তার ছায়াছন্ন এক একটি কোণ, মূল্যবান পর্দা; সিলিংয়ে ঝোলানো পেতলের ঝাড়বাতি, বাজপাখির মূর্তি সব মিলিয়ে কেমন আশ্চর্য হয়ে ওঠে পরিপার্শ্ব।

'তাহলে ছোট্ট একটা কাজ করতে দাও।' যেন অনুমতি চাইছে করিম। পকেট থেকে একটা ভেলভেটের বাক্স বের করলো সে। বাক্স খুলে বের করলো এক ছড়া হীরের হার। তারপর তা পরিয়ে দিলো লিণ্ডার গলায়।

'এগুলোকে বলে চন্দ্রহীরক। কেননা জ্যোৎস্না প্লাবিত মরু-

ভূমিতেই এই হীরেগুলো খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো।'
বাকহীন হয়ে যায় লিণ্ডা। করিম তাকে এতো ভালোবাসে? সে কোনো কথা খুঁজে পায়না। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলে, 'তুমি এতো উদার, করিম?'
'কেননা, তুমিও অনুদার নও। তোমার উদারতা যে আমারও প্রয়োজন লিণ্ডা! তুমি নিজেকে সমর্পণ করবে আমার হাতে। আমার কাছে তুমিই তো সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এইসব হীরে জহরৎ তোমার কাছে নিত্যান্তই নিষ্প্রভ লিণ্ডা। আচ্ছা, বলোতো, আজ তুমি কোন্ সুগন্ধী মেখেছো। দারুন সুঘ্রাণ। কালও এটা মাখবে—কেমন?' মুগ্ধতার সঙ্গে বললো করিম।
'সত্যিই দারুন সুগন্ধী এটি। মনে হয় সপ্তাহখানেক লেগে থাকবে।' বললো লিণ্ডা।
'তুমিও কি তাই থাকবে?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো করিম।
'অনাহারে থাকলে আমার দশাও বোধহয় তাই হবে।'
'কী সর্বনাশ।' কপট দুশ্চিন্তায় মুখভার করে করিম বললো, 'এক্ষুণি মুখে কিছু দিতে হয় তাহলে। আমি কিছুতেই একটা আধমরা বউ চাইবোনা।' বলতে বলতে তাকে খাবার টেবিলের দিকে নিয়ে গেলো করিম। জীবনে প্রথম বারের মতো সেখানেই কস্‌কস্ খেলো লিণ্ডা। অত্যন্ত সুস্বাদু এই খাবারটি তৈরী হয়েছে নাকি ভেড়ার মাংস, চাল এবং গুল্মলতা মিশিয়ে।
'কেমন লাগলো?' জিজ্ঞেস করলো করিম।

'অপূর্ব। এর কোনো তুলনা হয়না।' জবাব দিলো লিণ্ডা।
'শুনে সুখী হলাম। স্বাস্থ্যের জন্যে এই কস্‌কস্‌ খুব দরকারী খাবার। আমি কিন্তু স্বাস্থ্যবতী বউ চাই।'
'শুনেছি, পুবের লোকেরা নাকি স্থূলাঙ্গিনী স্ত্রীই বেশি পছন্দ করে? নধর দেহ আর গোলগাল হাত পা হলেই নাকি পুবের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি সুন্দরী হিসেবে গন্য হয়।'
'কী যে বলো তুমি লিণ্ডা। ওসব সেকেলে নিয়ম-নীতির কথা রাখো তো। এখন আর সেদিন নেই, বুঝলে? হেরেমের যুগ আর নেই। এই রাস ব্লাংকায় একটা সুইমিং পুল রয়েছে জানো? আরো আছে টেনিস কোর্ট আর আস্তাবল। সেখানে তেজী ঘোড়া মওজুদ আছে সব সময়। তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো? না জানলে আমি শিখিয়ে দেবোখন।'
'নিশ্চয়ই শেখাবে করিম।' ডিনারের পর হালকা সুরা পরিবেষন করা হয়েছে টেবিলে। লিণ্ডা গ্লাসে আলতো চুমুক দিয়ে বললো, 'আর যেটুকু সময় হাতে থাকবে, আমি করবো সঙ্গীত চর্চা।'
'খুব সম্ভব সঙ্গীত চর্চার খানিকটা অবকাশ তোমার থাকবে।'
'রাখতেই হবে। আমাকে যে রোজই রেওয়াজ করতে হয়।'
'একটা ওস্তাদ ধরে আনতে পারলে বেশ হতো, তাই না?' কথাটা শুনে খারাপ লাগলো লিণ্ডার। সে ভাবলো, তাকে কষ্ট দেবার জন্যে করিম একথা বলছে। মুখটা গম্ভীর হয়ে গেলো তার। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে লিণ্ডার মাথাটা ধরে তাকে

একটা চুমু খেলো করিম, 'কী হয়েছে খুকি— রাগ হয়েছে বুঝি? শোনো মেয়ে। আমি তোমার ওস্তাদ হতে পারি। কিন্তু সঙ্গীতের স-ও আমার জানা নেই। তবে আমি ঘোড়ায় চড়া শেখাতে পারি তোমাকে। মরুভূমিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে যা মজা— ওহ্— তুমি কল্পনাও করতে পারবে না লিণ্ডা। আমরা মাঝেমধ্যেই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়বো— কি বলো?' লিণ্ডাকে চুপচাপ দেখে করিম আবার বলে উঠলো, 'তোমার মনের ভেতর কি হচ্ছে। আমি তা জানি। বুঝলে লিণ্ড।'

'তাই নাকি?' জিজ্ঞেস করলো লিণ্ডা।

'তোমার মনের মধ্যে চলেছে সন্দেহ আর ভয়ের তুলুনি, কিন্তু একটা ব্যাপারে তুমি কিন্তু নিরুপায়।'

'সেটা কি?'

'বাসনা। তোমার আমার মিলিত বাসনা। কাল আমাদের বিয়ে হচ্ছে। বিয়ে হচ্ছে কেননা তোমার মুখ আর দেহের সৌন্দর্য আমার কাছে আকর্ষনীয়। আমার বাহু-বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তুমি বুঝতে পারবে, কি জন্যে তোমার জন্ম হয়েছে।'

কফি খাবার পর একটা কাশ্মিরী শাল কাঁধের ওপর রেখে গেলো পারভীন। ওরা দু'জন হাঁটতে হাঁটতে এলো সামনের বিশাল প্রাঙ্গনে। রাশি রাশি ফুলের ওপর জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে এখন। মৃদু বাতাস বইছে। পাথরের দেয়ালের

গায়ে বাতিদানে জ্বলছে আলো। দেয়ালের ওপাশেই ধুধু মরুপ্রান্তর। সেই প্রান্তর লিণ্ডার কাছে যেমন সুন্দর ঠিক তেমনি ভয়ঙ্কর। নিচে মরুভূমি। ওপরে আকাশ। আকাশ ভরে গেছে তারায় তারায়।

করিম তাকে মরুভূমির গল্প শোনালো। বালুকাসমুদ্রের সঙ্গে ঘনিষ্টতা তার ছেলেবেলা থেকেই। করিম আর লিণ্ডা গল্প করছে আর হাঁটছে। হঠাৎ ভয়ংকর একটা গর্জন ভেসে এলো দেয়ালের ওধার থেকে। ভয়ে করিমকে জড়িয়ে ধরলো লিণ্ডা।

'ও কিছু নয়।' করিম আশ্বস্ত করে--মরু বিড়াল।' বুকের ওপর টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে লিণ্ডাকে আদর করে করিম। 'পানির খোঁজে বেরিয়েছে ওরা। রাত হলেই বেরিয়ে পড়ে।··· একটা কথা বলি লিণ্ডা। ভালোবাসা সম্পর্কে তোমার ধারনা কি? তুমি কি কখনো স্বপ্ন দেখেছো। এটা এমন একটা অক্ষয় কীর্তি, মৃত্যুও যাকে ধ্বংস করতে পারেনা।'

'আমি যদি ওরকম স্বপ্নই দেখতাম, তাহলে কি আর এখানে আসি?' বলে উঠলো লিণ্ডা।

'ঠিক বলেছো লিণ্ডা। চলো, এখন শুয়ে পড়বে গিয়ে। কালকের দিনটা আমাদের দুজনের জীবনে কিভাবে আসছে, কে জানে?' বলতে বলতে দীর্ঘ চুম্বনে আবদ্ধ করলো করিম। দু'জন দু'জনের হৃদস্পন্দনের শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই শুনতে পাচ্ছিলো না।

বাড়ির ভেতরে ঢুকেই আলাদা হয়ে গেলো তারা। এগিয়ে গেলো যার যার ঘরের দিকে। আজকের মতো এই ছিলো তাদের শেষ সাক্ষাৎ। কাল মৌলবীর সামনে বসে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার আগে তাদের আর দেখা হবেনা।

'শুভরাত্রি। কামনা করি সুন্দর স্বপ্ন।' হাত তুলে বললো করিম।

'শুভরাত্রি, করিম।' নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো লিণ্ডা। অনেকটা গিয়ে কি মনে করে তাকালো সে পেছন ফিরে। আশ্চর্য! প্যাসেজের শেষ মাথায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে করিম। মনের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে লিণ্ডার। নিজেকে সান্ত্বনা দেয় সে। এই তো, আজকের রাতটা পোহালেই সমস্ত প্রতীক্ষার অবসান। কালকেই তারা শোবার জন্য দু'জন দু'দিকে হেঁটে যাবে না। কাল থেকে করিম আল খালিদ তার স্বামী। নানা কথা ভাবতে ভাবতে নিজের বেডরুমের ভেতরে ঢুকে পড়লো লিন্ডা। দেখলো, তার শয্যার পাশে একটা টুলের ওপর বসে ঘুমে ঢুলছে পারভিন।

লিণ্ডা পরম স্নেহে তুলে দাঁড় করালো পারভীনকে। বললো, 'আমার পাশে বসে থাকার কোনো দরকার নেই। তুমি তোমার নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি!' পারভীন সম্মতি সূচক ভাবে মাথা নাড়লেও তাকে ভয়ার্ত মনে হলো। হুসেইন তাকে হুকুম দিয়েছে লেল্লাহ-র পাশে সব সময় থাকার জন্যে।

কাল সোফিয়াকে বলে দিতে হবে কথাটা। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো লিণ্ডা। বলে দেবে পারভীনকে তার ফরমাস শোনার জন্যে সারাক্ষণ বসে থাকার দরকার নেই। ষোলো বছরও পুরো হয়নি মেয়েটির। এ বয়েসে এতো খাটুনি সহ্য হয়? বরং দরকার হলেই ওকে ডেকে নেবে লিণ্ডা।

'বিছানায় যাও!' লিণ্ডা বললো। মৃদু হেসে পরক্ষণে আবার বললো, 'এমশি বেসেলেমা!'

হেসে কুটিপাটি হলো পারভীন। তারপর বললো, 'লেইল-তাক সাইয়েদা, লেল্লাহ!'

পারভীন বিদায় নিলে রাজসিক শয্যায় গা এলিয়ে দিলো লিণ্ডা। কিন্তু ঘুম কোথায়? কতো কথা মনে আসছে ভীড় করে? কাল তার বিয়ে। মনের মধ্যে সেই রোমাঞ্চ। অনাবিল এক আনন্দ তো আছেই। কিন্তু তার পরও মনটা কেমন বিষণ্ন যেন। এই বিষন্নতার উৎস কি? হঠাৎ করেই উৎসটা খুঁজে পায় লিণ্ডা। কাল তার বিয়ে। অথচ এমন দিনে চাচা কিংবা চাচী তার কাছে নেই। নিজেকে কীরকম যেন অপরাধী মনে হচ্ছে লিণ্ডার।

যেভাবেই হোক, তাদের কাছেই তো সে বড়ো হয়েছে। হেনরী চাচা তো তাকে খুবই আদর করতো। ওর বিয়ের চিঠি পেয়ে তাদের মনের অবস্থা কেমন হবে, ভাবতেও খারাপ লাগে লিণ্ডার। ছিঃ! কী মনে করবে তারা।

বিশেষ করে ডোরিস চাচী যখন জানতে পারবে, সে একটা আধা আরবকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, তখন যে তার মানসিক যাতনা কতোখানি বাড়বে তা যেন দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে লিণ্ডা। স্প্যানিয়ার্ডদের তো সব সময় অর্ধসভ্য বলে গালাগাল করতো চাচী।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো লিণ্ডা। তার চার পাশে নেমে আসছে মশারী। আস্তে আস্তে নিভে আসছে বাতিগুলো।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই শয্যা ত্যাগ করলো লিণ্ডা। পর্দার ফাঁক দিয়ে রোদের ছটা আসছে। ক্লান্তিতে একটা হাই তুলে ঘরের চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সে। আস্তে আস্তে বাথরুমে গেলো। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে ফিরে এসে দ্যাখে, টেবিলে নাশতা সাজিয়েছে পারভীন। কমলার রস, ক্রিস্প রোলস, মধু এবং কফি। লিণ্ডাকে খুব স্বাভাবিক ভাবে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দেখে অপেক্ষমান পারভীন আর সোফিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। আজ যে মেয়ের বিয়ের ভোর, তাকে এমন সাদাসিধে দেখাচ্ছে কেন? মুখের রেখায় কোনো ভাবান্তর নেই।

'বেলা বাড়ছে লেল্লাহ।' মৃদু উদ্বেগ দেখা দিলো সোফিয়ার মুখে। 'হাতে আমার একগাদা কাজ পড়ে আছে। আপনাকে গোসল করানো আছে। সাজানো গোছানো আছে। কাজ কি আমার দুটো একটা গো?'

'আমার বিয়ে, তাই না?' যেন স্বপ্নের ভেতরে কথা বলছে লিণ্ডা। 'তাহলে সত্যিই আমার বিয়ে হতে চলেছে।'

'হ্যাঁ গো লেল্লাহ, হ্যাঁ।' খুশিতে ঝলমল করছে সোফিয়ার মুখ। 'আপনি সুখী তো লেল্লাহ?'

'অবশ্যই।' জবাব দিলো লিণ্ডা। কিন্তু আসলেই কি তাই? লিণ্ডা নিজেকে প্রশ্ন করে মনে মনে। সুখী যদি সে হয়েও থাকে, তবে তা কতোটুকু? জানতে ইচ্ছে করে তার। পরিচারিকাদের হাতে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সমর্পণ করলো লিণ্ডা। তারা তাকে গোসলখানায় নিয়ে গেলো স্নান করাতে। সঙ্গে সংগে নানা রকম সুগন্ধীর সুরভিতে ভরে উঠলো স্নানাগার। গোসলের শেষে তার নখে হালকা গোলাপী নখ-রঞ্জক লাগিয়ে দিলো পারভীন। কী একটা লোশন যেন ওরা ভালোভাবে মাখিয়ে দিলো লিণ্ডার সমস্ত শরীরে। হঠাৎ পারভীন যেন কানে কানে কি একটা কথা বললো সোফিয়াকে। সোফিয়া হেসে উঠলো।

'হাসিখুশিতে আমিও কি যোগ দিতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো লিন্‌ডা। সোফিয়া তখন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেলো। ফিস ফিস করে বললো, 'প্রাচ্যদেশের মেয়েরা নিজেদের গোপন অংগে চুল গজাতে দেয়না। কিন্তু আমরা দেখলাম, আপনারগুলো বেশ বাড়বাড়ন্ত। এটা ঠিক নয়। তাই লেল্লাহ যদি বলেন, এগুলো পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হতে পারে।'

একথা শুনে হেসে উঠলেও, চাচীর স্মৃতি মনে পড়ায় মুখটা থমথমে হয়ে গেলো লিণ্ডার। চাচী তাকে কিছুই শেখায় নি। অথচ ছোট বেলা থেকেই কতোকিছুর পাঠ নিতে হয় মেয়েদের। তেরো বছর বয়সে স্বাভাবিক ভাবেই রজঃস্বলা হয় লিণ্ডা। কিন্তু এ ব্যাপারে ডোরিস চাচী তাকে কোনোদিন কিছু বলেনি। স্কুলের সহপাঠিনী বন্ধুদের কাছ থেকেই এ অদ্ভুত ব্যাপারটা সে জানতে পারে। সেদিন চাচী তাকে কোনোরকম সহানুভূতি দেখায় নি। শেষে চাচা এক পেয়ালা কফি হাতে দোতলায় উঠে এসে কথাবার্তা বলেছিলো তার সঙ্গে। বলেছিলো: কী আর করবে মা জননী। সবই প্রকৃতির লীলা। এটা হবেই। এতে অস্বস্তির কি আছে বলোতো।'

লিন্‌ডা বললো, 'থাকনা ঝামেলা আপাতত। শেখ সাহেব তো জানেনই যে তিনি একজন ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। কাজেই—' সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো লিণ্ডা। কথা শেষ করলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যে লিন্‌ডাকে সাজিয়ে তুললো ওরা। অপরূপ সাজে সাজিয়েছে সত্যি। জমকালো পোশাক আর দুর্লভ প্রসাধনে লিন্‌ডাকে একটা প্রকাণ্ড গোলাপের মতো মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু মস্ত খুঁত রয়েই গেছে একটা। সাটিনের পোশাকের নিচে উৎকট মনে হচ্ছে তার নিজের জুতো জোড়া। স্লিপার পায়ে লাগেনি বলে সোফিয়া অমন আঁৎকে

উঠেছিলো কেন, আঁচ করতে পারছে এখন লিন্‌ডা। তার পায়ের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলো সোফিয়া আর পারভীন। উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। মুখে বলছিলো, বাবুচেস বাবু চেস। শব্দটার মানে জানে লিন্‌ডা—স্লিপার।

'কী হলো তোমাদের?' জিজ্ঞেস করলো লিন্‌ডা।

'না, কিছু হয়নি লেল্লাহ,' পারভীন বলছিলো, 'ওর এক জোড়া স্লিপার আছে। আপনার পায়ে লাগবে। কেননা আপনাদের দু'জনের পা সমান। স্লিপার জোড়া ও কখনো পায়ে দেয়নি।'

'বড়োই মিষ্টি মেয়ে পারভীন। মায়া দয়া আছে। ওকে বলে দিও তো সোফি, আমার জন্যে কষ্ট করে যেন রাত না জাগে। আহারে বেচারী। কাল আমি শুতে এসে দেখি, টুলে বসে ঢুলছে। এই টুকুন বাচ্চা মেয়ে এতো কষ্ট করতে পারে?'

'বাচ্চা মেয়ে? বলেন কি লেল্লাহ। ও মোটেই বাচ্চা মেয়ে নয়।'

'কী বলছো তুমি। ওর বয়েস ষোলো বছরের বেশি হয়নি।'

'তা হয়নি। কিন্তু ও বাচ্চা মেয়ে কোথায়? আরব দেশের মেয়েরা কম বয়েসেই অনেক কিছু বুঝতে শেখে, করতে শেখে। আর আপনার জন্যে অপেক্ষা করা, এটা তো ওর দায়িত্ব। শেখ যদি একবার জানতে পারেন যে ও টুলে বসে ঢুলেছে তাহলে।'

'বলো কী?' লিন্‌ডা বিস্মিত হলো। তাকিয়ে রইলো

সোফিয়া আর পারভীনের মুখের দিকে। বেশ সুন্দর দেখতে মেয়ে দুটো। আহা, এই বয়েসের মেয়েরা হেসে খেলে বেড়াবে, প্রজাপতির মতো ফুর ফুর করে উড়বে, তা নয়, কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। পারভীন সন্তর্পনে বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখা একটা প্যাকেট বের করলো। নীল রঙের এক জোড়া নরম স্লিপার বের হলো সেই প্যাকেটের ভেতর থেকে। লিণ্ডা তা পায়ে গলাবার সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো পারভীনের মুখ।

'আমার পুরনো কিছু আছে।' লিণ্ডা তার নিজের ব্রেসলেটের ওপর আঙুল রাখলো। 'আমার নীল রয়েছে কাছে।' লিণ্ডা পা তুলে নীল রঙের স্লিপার দেখালো। তারপর আবারো বললো, 'আমার পোশাকটি আনকোরা, আমার ধার দে কিছু তোরা!'

'এটা কী কোনো বিলিতি প্রবাদ?' জিজ্ঞেস করলো সোফিয়া।

'হ্যাঁ। তবে খুবই পুরনো।'

'এ নিশ্চয় অমংগল তাড়ানো মন্তর?' সোফিয়া উৎসুকভাবে তাকালো লিণ্ডার দিকে। কোনোরকম জবাবের তোয়াক্কা না করেই স্বগতোক্তি করলো, 'তাহলে বিলিতি মেয়েরাও খারাপ আছর থেকে দূরে থাকতে চায়?'

'কখনো কখনো চায় বৈকি!' উত্তর দিলো লিণ্ডা।

'তাহলে এই তাবিজটা গলায় দিন লেল্লাহ।' বলতে বলতে নিজের গলা থেকে চেনে বাঁধা একটা লকেট খুলে দিলো

সোফিয়া। লকেটে যেন আরবী হরফে কী সব লেখা আছে। লিণ্ডা বিনা দ্বিধায় তাবিজটা গলায় পরলো। করিমের দেয়া বহু মূল্য হীরের নেকলেসের গায়ে গা লাগিয়ে দুলতে লাগলো সোফিয়ার দেয়া কবজখানা।

'ধন্যবাদ সোফিয়া।' বলতে বলতে বড়ো আয়নায় চোখ পড়ে গেলো লিণ্ডার। নিজেকে দেখে সে প্রথমে চিনতেই পারলো না। দিব্যি একজন আরব দেশীয় কনে বলে মনে হচ্ছে তাকে। সাজানো শেষ হলে পাখির নরম পালক দিয়ে লিণ্ডার চোখে 'হুল' লাগিয়ে দিলো ওরা। পরীর মতোই সুন্দর মনে হতে লাগলো এবার তাকে।

সব শেষে ঘরের দরজায় টোকা দিলো কেউ। সোফিয়া দরজা খুলে কারো হাত থেকে একটা ছোট বাক্স নিয়ে এলো। সাদা চামড়ার এধরনের বাক্সে সাধারণতঃ গহনা থাকে। যাই হোক, বাক্সটার ডালা খুলতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লো সেই পূর্বশ্রুত অ্যাংকলেট। করিম যে জিনিস-টির কথা আগেই বলেছিলো লিণ্ডাকে। কিন্তু তার বর্ণনামতে এ তো একটা সামান্য চেন নয়। সোনার পড়া অনেকগুলো হরতন জুড়ে অদ্ভুত একটা অলঙ্কার বানানো হয়েছে। অলঙ্কার না বলে যন্ত্র বললেই সঠিক বলা হয় খুব সম্ভব। এক ধরনের অনুভূতি জাগলো তার মনে।

'হায় খোদা। আমাকে ঠিক একটা সেকেলে সঙের মতো মনে হচ্ছে। জলজ্যান্ত একটা ওদালিস্ক যেন।' বিস্মিত

কণ্ঠে বললো লিণ্ডা। মনে হলো এই মুহূর্তে পোশাক আসাক সব খুলে ফ্যালে সে। ওয়ার্ডরোব থেকে বের করে পরে নেয় সব চেয়ে সাধারণ, সব থেকে সাদামাঠা পোশাকটি। কিন্তু সময় নেই আর বিন্দুমাত্র। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে করিম আল খালিদের সামনে হাজির হতে হবে।

সোফিয়া প্রস্তুত। সে লিণ্ডার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিলো হেজাম বলে এক ধরনের কালো বোরখায়। পদ্ম ফোটা সরোবরের পাশে অপেক্ষা করছে বরবেশী করিম। তার সংগে রয়েছে বেশ কয়েকজন লোক। প্রথা মাফিক আরবী পোশাকই পরেছে করিম। মাথার কাপড়টা সোনালী দড়িতে পেঁচিয়ে বাঁধা। তাকে দেখে প্রথমে যেন চিনতেই পারলো না লিন্ডা। একদম অন্যরকম, অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে শিল্পীর আঁকা কোনো আরব লোকের ছবি।

করিম আলতো ভাবে হাত ধরলো লিন্ডার। তারপর এগিয়ে চললো বিবাহ মঞ্চের দিকে। সেখানে ঝকঝকে টাইলের মেঝে। মোয়াজ্জেম অপেক্ষা করছে বিয়ে পড়াবার জন্যে। তার সমনে মখমলের আসন পাতা। প্রথমে করিম আরবী ভাষায় কিছু উচ্চারণ করবে। লিন্ডার বুঝবার সুবিধার জন্যে তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনানো হবে সংগে সংগে। সারা দুনিয়ায় প্রায় এক ভাবেই বিয়ে পড়ানো হয়। কেবল ভাষা আর প্রথাটা হয়তো আলাদা। স্বামী স্ত্রী দুজনেই যে দু'জনের জন্যে আত্ম-নিবেদন করবে—সে প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত

হয় সব বিয়েতেই।

লিন্‌ডা আর করিম মুখোমুখি দাঁড়ালো। তাদের দুজনের দুটি হাত মক্কার সবুজ সিল্‌কের ফিতে দিয়ে বাঁধা। আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পেশ ও তা লিপিবদ্ধ করা হলো নিয়ম মাফিক। সাক্ষীরা স্বাক্ষর করলো। আরবীতে লেখা বিয়ের দলিলে সই করলো বর কনে। লিন্‌ডার হাতে কলম তেমন সচল ছিলোনা। তবে করিম খসখস করে সই করে দিলো নিজের নাম।

পশ্চিমী দেশের কায়দায় কনেকে আলিংগন কিংবা চুম্বন করতে পারলো না বর। প্রকাশ্যে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক স্পর্শ পর্যন্ত নিষিদ্ধ এদেশে। যাই হোক, বিয়ে হয়ে গেলো ওদের। এখন বন্ধুদের সংগে ঘন্টাখানেক কাটাবে করিম। এই সময়টুকু একা থাকতে হবে লিন্‌ডাকে।

ঠান্‌ডা লেমোনেড এনে দেয়া হলো লিন্‌ডাকে। পিপাসা অনেকটা মিটলো যেন শীতল পানীয় পান করে। একটা কুশনে হেলান দিয়ে বসলো লিন্‌ডা। বোরখার নেকাব সরাতে পারলো কিছুক্ষণের জন্যে। ইতিমধ্যে তার জন্যে হালকা খাবারও দেয়া হয়েছে। ওমলেট পনির আর বাদামের কেক। সেই সংগে মিন্ট-চা।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকলে লিণ্ডা 'সালা'র সাজসজ্জা দেখতে লাগলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাহলে সে এখন শেখ পত্নী। সে এখন আর বিলেত দেশের মেয়েটি মাত্র নয়। করিম আল খালিদের সুখ দুঃখের সাথী এখন লিন্‌ডা। অল্পক্ষণের মধ্যেই

সে এখন তার কাছে আসবে, সেইই হবে লিন্‌ডার দেহের স্বত্বাধিকারী—ভাগ্যের প্রভু।

৬

হঠাৎ নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হলো লিণ্ডার। মনে হলো সে তার মাথাটা আলতোভাবে রেখেছে করিমের কাঁধে। করিমের দেহের উষ্ণতা, তার সংস্পর্শ যেন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে ঘটনার বাস্তবতাকে। লিণ্ডা আজ সত্যিই এই সম্রাট সদৃশ্য পুরুষের বিয়ে করা বউ। সব অনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে যে তার স্বামীত্বের দাবি নিয়ে স্ত্রীর কাছে এসেছে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। কিছু একটা বলতে যাবে লিন্‌ডা, হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে হোসাইনের প্রবেশ। স্বপ্নটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে যায় তার। সে বুঝতে পারে করিম তার পাশে নেই। লিন্‌ডা তার কথা কল্পনা করছিলো মাত্র। হোসাইন জানালো, হুজুর এখন তাঁর বন্ধু বান্ধবদের বিদায় জানাচ্ছেন।

আসলেও তাই, মেহমানরা প্রায় লাইন-বন্দী হয়ে লিন্‌ডার কক্ষের পাশ দিয়েই করিমের রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

লিন্‌ডা অনুভব করলো, করিম দূর থেকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু সে তার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছিলো না। করিমের নরম হাসির শব্দ পর্যন্ত সে শুনতে পাচ্ছিলো। কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত লজ্জা এসে যেন ভর করেছে তার চোখের পাতায়।

কিছুক্ষণ পর মূল কক্ষে প্রবেশ করলো লিন্‌ডা। বিশাল বিছানা দেখতে পেলো একটা সে। মুখ থেকে কোনো কথা বের করার আগেই করিম বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

'এ অনুষ্ঠানিকতারও ইতিহাস আছে।' বললো করিম। এজন্যে আমাদের যেতে হবে রোম সাম্রাজ্যের অতীত দিনের কাছে। রোমান সৈন্যরা যেমন গ্রামে গিয়ে সাবাইন মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যেতো এবং ধর্ষন করতো, আমি অনেকটা তেমন ভাবেই তোমাকে ছিনিয়ে নিয়েছি তোমার আপনজনদের কাছ থকে।'

'আমি, আমি কোনো অভিযোগ করছি না।' লিন্‌ডা কথা বলছে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে। কেননা, আশেপাশে এখন আর কেউ নেই। কেবল সে আর করিম। এই প্রথম একান্তে কাছে পেয়েছে সে করিমকে। 'জানো, সবকিছু যেন কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।' বললো সে আবার।

'সব বুঝলাম, এবার ঘোমটা খোলো তো রাজকন্যে!' করিম লিণ্ডার মুখের ওপর থেকে নেকাবটা সরিয়ে দিলো। 'তোমার

সমস্ত লজ্জা হরণ করার অপরাধে আমি এক অপরাধী লিণ্ডা। তুমি আমাকে খুব লজ্জা পাও—তাই না?'

'পাই।' করিমের বুকের মধ্যে মুখ চেপে ধরে লিণ্ডা বললো, 'তুমি যেন কীরকম পুরুষ। দেখলেই লজ্জা হয়।'

করিমের শক্ত আঙুলগুলো কেবল তার নেকাব সরিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। সাটিনের তৈরী বিয়ের পোশাকের বোতামগুলো খুলতে শুরু করেছে একে একে। ধীরে ধীরে একেবারে নগ্ন করলো করিম লিন্ডাকে। পোশাকগুলো ছুঁড়ে ফেললো মেঝের ওপর। 'যে দিন আমাদের প্রথম দেখা হলো, এই কাজটির প্রবৃত্তি জন্মেছে আমার মধ্যে সেই দিন থেকেই।' বললো করিম। তার উষ্ণ স্পর্শ এখন লিন্ডার সমস্ত শরীরে। প্রতিটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠছিলো লিন্ডা। যেন একটা পুতুল নিয়ে খেলা করছে করিম। ক্রমে নিজের পোশাকগুলোও খুলে ফেললো সে। পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো নিখুঁত দেহ। লিণ্ডা সেই শক্তিময় সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো যুগপৎ লজ্জা ও আনন্দের সঙ্গে। দু'টি শরীর হঠাৎ পরস্পরের সংলগ্ন হলো। লিন্ডার চিৎ হয়ে শোয়া নগ্ন দেহের ওপর উবু হয়ে শুয়ে পড়লো উলঙ্গ করিম। তারপর তার জিহবাটা খুব অলসভাবে যেন লেহন করতে শুরু করলো লিন্ডার দেহের সর্বত্র। জিহবাটা ক্রমে লিন্ডার মুখ এবং বুক পেরিয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে লাগলো। আবেশে দুচোখ বুঁজে আসতে লাগলো

লিণ্ডার। ভেতরে তো দেখা দিয়েছে ঝড়ের দোলা।

'ওহ, হ্যাঁ।' লিণ্ডা অস্পষ্টভাবে বললো, 'ওহ করিম, লক্ষ্মীটি।'

'তুমি একটা বিরাট বিস্ময়। তোমাকে দেখলে তো প্রথমে মনে হয়, সূর্যের নিচে রাখা এক খণ্ড বরফের মতো কিন্তু ভেতরে তোমার এতো উষ্ণতা। আমি যতোটুকু ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক, অনেক বেশি উদ্দীপক তুমি। আমার কি মনে হচ্ছে জানো। তোমার ধমনিতে লাতিন রক্ত আছে।'

'না!' লিণ্ডা করিমের কালো ও আকর্ষণীয় চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার দেহে লাতিন রক্ত নেই, কিন্তু আমি—'

কিন্তু সেসব ব্যাখ্যা শোনার অবকাশ কোথায় করিমের। সে পিপাসার্ত পথিকের মতো মরুস্থানের সমস্ত পানি চেটে চেটে নিচ্ছে তখন। আস্তে আস্তে উভয়ে যখন মাহেন্দ্র ক্ষণটিতে পৌঁছলো—লিণ্ডার আঙ্গুলের নখগুলো বর্শা ফলকের মতো বিদ্ধ হতে চাইলো করিমের কাঁধের মাংসে। প্রচণ্ড আবেগে বার কয়েক লিন্‌ডা উচ্চারণ করলো করিমের নাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

'তাহলে কাজটা হয়েই গেলো, কি বলো!' প্রশ্ন করলো করিম।

'কি কাজ?' অস্পষ্ট কণ্ঠ লিণ্ডার।

'তোমার গর্ভে এখন আমার সন্তান।'

'যদি তা না হয় ?'

মৃদু হেসে পরপর দু'টি স্তনের ওপর চুমু খেলো এবার করিম। বললো, 'কোনো কোনো ব্যাপারে তুমি নিতান্তই শিশু। কিন্তু আমি বড়ো স্বার্থপর, বুঝলে! যে সময়টিতে আমাদের দৈহিক মিলন ঘটলো—এক আসাধারণ শিশুর মা-বাবা আমরা নিশ্চয়ই হবো। তা, তুমি তো এবারই প্রথম একাজ করলে ?'

'হ্যাঁ।' লজ্জায় মাথা নত করে জবাব দেয় লিন্‌ডা। তাকে পরপর কয়েকটা চুমু খেলো করিম। স্তনের ওপর টোকা দিলো মৃদু মৃদু। হঠাৎ লিন্‌ডার বাঁ হাতের ব্রেসলেটের ওপর নজর পড়লো করিমের। হাতটা আলোর কাছে নিয়ে করিম দেখলো, হরতনের মাঝখানে একটা নাম লেখা।

'মরিয়ম' হরতনের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে করিম এবার লিন্‌ডার মুখের দিকে তাকায়। 'এটা কি কোনো ইংরেজ নাম ?' সে জিজ্ঞেস করে লিন্‌ডাকে।

'না।' লিন্‌ডা মৃদু হাসে। তারপর করিমের বুকের ওপর আঙুল বুলাতে বুলাতে বলে, 'এটা জুদাইক। আমার মায়ের আত্মীয় পরিজন নাৎসীদের হাতে নিঃশেষ হয়ে যায়। কেবল তার বাবা কোনোমতে পালাতে সক্ষম হয় এক শ্রম-শিবির থেকে। ইল্যান্‌ডে পৌঁছে সে যোগ দেয় প্রতিরোধের আন্দোলনে। যুদ্ধ শেষ হলে সে চলে যায় ইংল্যান্‌ডে। খুলে বসে ছোটখাটো একটা হার্ড অয়্যারের দোকান। তার পর বিয়ে করে। কিছুদিন পর তাদের ঘরে আমার মায়ের

জন্ম।

কথা বলতে বলতে এক ধরনের হাসিও এতোক্ষণ উপহার দিয়ে চলেছিলো লিন্‌ডা। হঠাৎ তার মুখ থেকে হাসির সেই ছটা যেন দপ করে নিভে গেলো। তার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ হচ্ছে করিম। করিম এতোক্ষণ মনোযোগ এবং সহানুভূতির সঙ্গেই লিন্‌ডার কাহিনী শুনছিলো। বর্ণনার এক পর্যায়ে আসতেই হঠাৎ মুখখানা কালো হয়ে গেলো করিমের। চোয়াল দুটো হয়ে উঠলো শক্ত, টান টান। ব্রেসলেট পরা লিন্‌ডার হাতটা সে ছেড়ে দিলো নিতান্তই অবহেলার সঙ্গে। বিছানার ওপর তরিৎ গতিতে উঠে বসলো সে। সরে গেলো লিন্‌ডার কাছ থেকে। করিমের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে এক ধরনের দুঃসহ যাতনা।

'তোমার মায়ের কথা আগে একেবারেই বলোনি যে।' কেমন অচেনা গলায় জিজ্ঞেস করে করিম। তাকে যেন কেমন ক্রুদ্ধ এবং অসহিষ্ণুও মনে হয়।

গায়ের ওপর বেড শিটটা টেনে দিয়ে বিব্রত গলায় লিণ্ডা বললো, 'তার কথা তেমন বিস্তারিতভাবে না-বলার কারণ আছে। সে আমাকে একেবারে শিশু অবস্থায় বাবার কাছে ফেলে রেখে আর এক লোকের সঙ্গে চলে যায়। তাকে আমি ঘৃণা করতাম। তাই তার কথা তেমন মুখে আনতে চাইনি। তাকে আমি কখনো দেখিনি। সে এখনো বেঁচে আছে কিনা আমি তা-ও জানিনা।'

'তোমার মায়ের ব্যাক গ্রাউণ্ড আমাকে খুলে বলোনি কেন?'

'তুমি হঠাৎ এরকম রেগে গেলে কেন, করিম?' খুব চিন্তাগ্রস্থ মনে হলো লিন্‌ডাকে। মনে হলো, সে খানিকটা ভয়ও পেয়েছে। বললো, 'আমি কী কোনো ক্রাটবিচ্যুতি করে ফেলেছি?'

'মনে হচ্ছে, তুমি কিছুই বুঝতে পারছো না?'

'বিশ্বাস করো, আমি কিছুই জানিনা, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বাবার দিক থেকে আমি একজন আরব।' বুকের ওপর মুছু আঘাত করে করিম বললো, 'কি করে আমি আরব বিরোধী রক্তের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবো? দাঙ্গার সময় আমার বাবাকে যারা নির্মমভাবে পিটিয়ে মেরেছে, তাদেরই বংশের এক-জনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয় কী করে? ওই হত্যাকাণ্ডের সময় আমার মা-ও আঘাত পায় মানসিকভাবে। তারপর মারাও যায় একদিন। তুমিই বলো কিভাবে আমি এটা মেনে নিতে পারি?'

কথাগুলো যেন ছুরির ফলার মতো বিদ্ধ করলো লিণ্ডাকে। মাথাটা ঘুরে উঠলো লিণ্ডার। চোখের সামনে সবকিছু তার ঝাপসা হয়ে এলো দ্রুত। মুখের উজ্জ্বলতাও যেন নিভে গেলো কেমন দেখতে দেখতে। লিণ্ডা কিছুতেই বুঝতে পারলো না— নিজের পিতার মৃত্যুর জন্যে যারা দায়ী, করিম তাদের সঙ্গে লিণ্ডার মাকে, এমনকি তাকেও জড়িয়ে ফেললো

কী ভাবে ?

'ঘটনাটা কি এতোখানি সম্পর্কযুক্ত। এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ?' ফিসফিস করে লিণ্ডা বললো, 'তাছাড়া এ কক্ষের বাইরে সে তথ্য আর কেউ তো জানেনা।'

'জানি।, কিন্তু তাতে কি খুব একটা স্বস্তি পাওয়া যাবে ?' রাগত গলায় উচ্চারণ করে করিম। দ্রুত সে উঠে যায় বিছানা ছেড়ে। মনে হচ্ছে, সে যেন প্রতারিত হয়েছে। 'বিষয়টাকে তুমি যতো সহজ মনে করেছো, ততোটা সহজ নয়।' করিম আবার বললো। 'সাংঘাতিক ব্যাপার এটা, বুঝলে ? তোমার আগেই একথা খুলে বলা উচিত ছিলো আমাকে। তা না করে তুমি আমার মনে এরকম ধারনাই দিয়েছো যে, তোমার মা খ্রীষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী।'

'তুমি—তুমি কখনো জিজ্ঞেস করোনি।' চোখে পানি এসে গেলো লিন্‌ডার।

'আমার বাবার হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও বলিনি ?'

'তুমি কখ্‌খনো বলোনি আমাকে।' সে তীব্রভাবে মাথা ঝাঁকালো। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তার গাল বেয়ে বেয়ে। 'এ ঘটনা আমি শুনি অ্যাডোরেকশনের কাছে। সে-ই আমাকে বলেছিলো, কীভাবে তোমার মা বাবার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সে আমাকে কখনো বলেনি, কারা তাকে মেরেছিলো। কারা দায়ী এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্যে। তুমিই বলো, কীভাবে আমি সে ঘটনা জানবো ?'

কথা শুনে পেছন ফিরে দাঁড়ালো করিম। সবল, সুন্দর দেহ-ধারী স্বামী তার। একটু আগেই কতো না আবেগ কতো না আদরে ভরে দিয়েছে সে লিণ্ডার দেহ মন। আর এখন? ক্রুদ্ধ, বিরক্ত এই লোকটিকে যেন চিনতেই পারছে না সে। এমন পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব? লিণ্ডা যেন ভেবেও পায়না। কলজেটা যেন মুচড়ে ওঠে তার। করিমের জন্যে দুঃখ হয়। দুঃখ হয় নিজের জন্যেও।

'আমাকে তাড়িয়ে দিওনা।' আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো লিণ্ডা। 'আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাইনি। আমার যেন শিগগীরই মৃত্যু হয়, তবু তুমি আমাকে ঘেন্না কোরোনা।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না করিম। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। 'ঘৃণা হচ্ছে একটি সঞ্জিবনী শব্দ।' সে বললো, 'ঘৃণা এমন একটি প্রবনতা যা আমাদের বোধের গভীরে বীজ বুনে দেয়।'

'তুমি, তুমি কী করতে চাও?' প্রায় শিশুর মতোই হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে লিণ্ডা জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে খেদিয়ে দেবে?'

'আবোল তাবোল কি সব বকছো?' আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে করিম বললো, 'কী করবো, তা এক্ষুনি কি করে বলি? এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে হবে তো।'

'তাহলে সব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো, করিম।' লিন্ডা বিছানার ওপর হাঁটু গেড়ে বসলো। চাদরটা তার শরীর থেকে পড়ে

গেছে অনেক খানি। স্তন দুটো সম্পূর্ণ বেরিয়ে পড়েছে—'আমি তোমাকে আমার সর্বাঙ্গ দিলাম, আর তুমি এখন আমাকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছো!'

লিন্‌ডার কথাগুলো স্পর্শ করলো করিমকে। সে চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে। তাকিয়ে রইলো লিন্‌ডাও।

'আমার মনে হয়, তোমার কুমারীত্ব হরণের আগেই আমি খোদাই করা ওই হরতনটা দেখি।' বললো করিম। 'কিন্তু আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। খুব সম্ভব তোমার গর্ভেও এখন আমার সন্তান। সেই সম্ভাবনাই বেশি। এ ক্ষেত্রে অপেক্ষা করে দেখতে পারি আমরা, অবস্থা কী দাঁড়ায়। তুমি যদি সত্যি গর্ভবতী হয়ে থাকো তাহলে আমার জীবন থেকে তোমাকে মুছে ফেলবো না। অতোটা কঠিন আমি নই।'

'কিন্তু যদি আমাদের বাচ্চা কাচ্চা না-হয়?' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসে তার। থর থর করে কেঁপে ওঠে সে।

'তাহলে সব শেষ।' তিনটি শব্দ উচ্চারণ করলো করিম।

'আমাদের প্রেম, বিয়ে ভালোলাগা সব মিথ্যে হয়ে যাবে?' লিন্‌ডা কাঁপছিলো কথাগুলো বলতে বলতে।

'কিসমৎ জিনিসটা সব সময় দয়া নিয়ে আসেনা।' বললো করিম। 'কখনো কখনো তা নিষ্ঠুরও হয়।'

'কিসমৎ নিষ্ঠুর নয়, নিষ্ঠুর হচ্ছো তুমি, হ্যাঁ তুমি।' লিন্‌ডা

চীৎকার করে উঠলো। তীব্র মানসিক যাতনা সইতে না পেরে সে উলঙ্গ অবস্থাতেই লাফ দিয়ে নামলো শয্যা থেকে। তারপর দৌড়ে গেলো করিমের সামনে। তার নির্বিকার মুখটার ওপর সে একের পর এক চপেটাঘাত করতে লাগলো পাগলের মতো।

হঠাৎ এক সময় যেন চমক ভাঙ্গলো লিণ্ডার। লাফ দিয়ে সে আবার উঠে গেলো বিছানায়। চাদরে গা ঢেকে বসলো আগের মতো। তার মুখ খানা এখন আরো সাদা মনে হচ্ছে। চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে। এবং চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে গেছে এরি মধ্যে। তাকে এ মুহূর্তে দেখে যে কেউ বলবে, তার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালানো হয়েছে।

'মেরেছি, বেশ করেছি।' লিণ্ডা পাগলের মতো বললো, 'হায়রে আমার কপাল। আমার মন বারবার বাধা দিচ্ছিলো। বার্সিলোনায় যখন গেলাম, একবার মনে হয়েছিলো, সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ি ব্রিটিশ কনসুলেটে। গিয়ে সব কথা খুলে বলি তাদের। তারা নিশ্চয়ই আমাকে ইংল্যাণ্ডে, আমার দেশে—আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতো। হায় খোদা, আমি এখন সেখানে যাবার জন্যে ছট ফট করছি। কী আশ্চর্য এ পৃথিবী। ক্রীতদাস প্রথা এখনো কি টিকে আছে দেশে দেশে? এখনো কি আরব প্রভুরা ভোগের জন্যে রমণী কেনে ক্রীতদাসীদের বাজার থেকে?'

'বকবক না করে আমার কথা শোনো।' করিম বললো আস্তে

আস্তে। তার চোখে যেন আগুন।— আজকের দিনেও আমি খুব সহজে ক্রীতদাসী ব্যবহার করতে পারি।'

'করো না কেন? করো।' নগ্ন কাঁধ তীব্র ভাবে ঝাঁকিয়ে বললো লিণ্ডা। তার বোধহয় মনেও নেই যে, সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় আছে এখন। 'আমি নিশ্চিত যে আমিও খুব সহজেই তোমার মরুভবন থেকে পিঠটান দিতে পারি। তারপর তোমায় নেটিভ ব্রিটিশ বউটি বালির সমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেলবে, এবং শেয়ালেরা একসময় তাকে ছিঁড়ে ঘুড়ে খাবে।'

'ঢের হয়েছে। এবার থামো!' ধমকে উঠলো করিম। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে বিশুদ্ধ স্বপ্ন বলেই মনে হলো লিণ্ডার কাছে। বিয়ের আসর, আনন্দ, আলো, প্রতিজ্ঞা 'আলিঙ্গন, সব কিছুই মিথ্যে বলে মনে হলো তার কাছে। সব মুছে গিয়ে কেবল একটা সত্যই এখন দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যটা হলো একদল দাঙ্গাবাজ মানুষ, যারা, একদিন হত্যা করেছিলো করিমের বাবাকে। অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছে এখন করিম আল খালিদকে। ভিন-পুরুষের সামনে নগ্ন হয়ে বসে থাকতে পারেনা কোনো রমনীই। লিণ্ডা অজানা অচেনা লোকটাকে তার দিকে তাকিয়ে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে— চট করে গিয়ে বিছানায় উঠলো। তারপর চাদরে ঢাকলো সারা শরীর। বেগানা পুরুষকে ন্যাংটা দেহ আর কেনই বা সে দেখাবে?

'আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম সরল বিশ্বাসে।' করিম

বললো, 'কিন্তু দুর্ভাগ্যেরই ব্যাপার, আমি এমন মেয়ে বিয়ে করলাম যে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে আমার শূন্য শৈশবের কথা। আমি চেয়েছিলাম একটি সদানন্দ সন্তান। সব সময় সে সুখী থাকবে, খুশি থাকবে। কিন্তু আমার সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। এখন আমি তোমার দিকে তাকালেই শিউরে উঠে দেখি আমার মায়ের প্রেতাত্মা।'

'তাহলে দোহাই তোমার, আমাকে দূরে সরিয়ে দাও। আমাকে বিলেতে, আমার দেশে ফিরতে দাও।' লিণ্ডা কাতর কণ্ঠে বলে, 'আমাকে তালাক দিয়ে দেয়া তো তোমার জন্যে খুবই সহজ ব্যাপার। তুমি তাইই করো। তারপর সম্পূর্ণ ভুলে যাও আগের অভিজ্ঞতা।'

'ব্যাপারটা এতো সহজ নয়।'

'অবশ্যই সহজ।' লিণ্ডা বললো—তুমি নিস্পৃহ থাকলে আমি অগ্রসর হবো।'

'কি করবে?' তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো করিম। তারপর বললো, 'তুমি চাইলেই তো হবে না। আমার মতামতেরও প্রয়োজন আছে। আমি মতামত দেবো না।'

'কেন দেবে না?' ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রায় চীৎকার করে ওঠে লিণ্ডা। 'তুমি কোন মুখে আমার কাছে সন্তান চাও? তোমার মন ভরা যে ঘৃণা, তাতে কিভাবে তুমি তাকে স্নেহ-ভালবাসা দেবে? তাছাড়া,' লিণ্ডা গলা নরম করে বললো, 'কুমারীরা অনেক ক্ষেত্রে শুরুতেই গর্ভধারণ করে না। যদি আমি তোমার

সন্তান ইতিমধ্যে গর্ভে না ধরে থাকি ?'

'সন্তান থাকতেই হবে।' করিম বললো, 'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কেননা আমরা তো একবার মিলিত হইনি। বহুবার মিলিত হয়েছি। তোমার মনে নেই ?'

'মিলিত হয়েছি।' ব্যঙ্গভরে বলে উঠলো লিণ্ডা। 'বলতে একটুও আটকালো না তোমার মুখে ? তুমি আমার দেহ সম্ভোগ করেছো ঠিকই, কিন্তু হৃদয়ে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারোনি। তুমি ক্যালেণ্ডারে টিক্ চিহ্ন দেয়ার পরও আমি এখানে থাকবো, তা কিছুতেই ভেবোনা। ছাখো, মর্যাদা আছে আমারও। তুমি যদি আমাকে না চাও, আমিও তোমাকে ছেড়ে যাবো।'

করিম এসে তার কাঁধে হাত রাখতেই লিণ্ডা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। 'ওগো তুমি যা বললে, তা সত্যি সত্যি করবে ?' আকুলভাবে জিজ্ঞেস করলো সে।

'ছাখো লিণ্ডা। তোমাকে বিয়ে করার পর তোমার ওপর আমার কতগুলো কর্তব্য অর্পিত হয়েছে। দায়িত্ব বর্তেছে আগামী দিনের অতিথি ওই শিশুটির ওপরও। কেননা সে বহন করে নেবে আমারই রক্তের ধারা।'

লিণ্ডা আবেগে দু'হাত বাড়িয়ে দিলো করিমের দিকে। কিন্তু করিম সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে। একটুও নড়লো না তার চোখের পাতা। পাথরের মূর্তির মতো সে দাঁড়িয়ে রইলো আগেরই জায়গায়।

'ও, তাহলে আমি এখানে থাকবো। কিন্তু তোমাকে ছুঁতেও পারবো না। অর্থাৎ তুমি মনেপ্রাণে আমাকে না চাইলেও আমি এ বাড়িতে বসবাস করতে পারবো। তাই না?'

'তোমাকে আমি চাই না, তা কে বললো?'

অভাবিত এ জবাব। লিণ্ডার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফ দিয়ে উঠলো। কিন্তু নির্বিকার দেখাচ্ছে করিম আল খালিদের মুখ।

'কিন্তু তুমি যে নিষিদ্ধ!'. মর্মঘাতী তিনটি শব্দ উচ্চারণ করে পাশের কক্ষে চলে গেলো করিম দ্রুতপায়ে। রাজসিক শয্যার ওপর কাঠের পুতুলের মতো স্থির হয়ে বসে রইলো লিন্‌ডা। পরক্ষণে যেন মাথায় রক্ত উঠে গেলো তার। সে আবার লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে ঢুকলো পাশের ঘরটিতে। চীৎকার করে উঠলো সে, 'নিষিদ্ধ? এর মানে কি? তুমি কি বোঝাতে চাও করিম? একি তুমি নিজের কথা বলছো, নাকি একথা আমি শুনছি শত শত বছর আগের কোনো আদিবাসী পুরোহিতের কণ্ঠে! তুমি না বর্তমান কালের মানুষ? নাকি এ তোমার আধুনিকতার ভান! বর্তমানে তোমার ভেতরে আসলে বসবাস করছে তোমার প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ। যারা নারীকে রেখে দিতো ঘোমটার আড়ালে, হেরেমবন্দী করে। প্রয়োজন মেটাতো যৌন ক্ষুধার।'

'যৌনতা আসলে পলায়নের এক ভিন্ন আঙ্গিক।' বললো

করিম।

'আমি আমার প্রশ্নের জবাব চেয়েছি। কোনো জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনতে চাইনি।'

'যৌনতা উপভোগও বটে।' বললো করিম। 'একথা আমি অস্বীকার করতে চাই না।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে অস্বীকার করতে চাইছো। চাইছো না?' সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালো লিন্‌ডা। 'শোনো, আমার দিকে তাকাও। আমিও কি আগের মতোই আছি, নাকি সম্পূর্ণ বদলে গেছি। সড়ক দুর্ঘটনা থেকে তুমি যখন আমাকে বাঁচাও, তখনকার কথা মনে আছে তোমার? মনে আছে তখনকার মুখটা? কি? কোনো রদবদল দেখতে পাচ্ছো?'

'আসলে আমাদের দু'জনেরই আশাভঙ্গ হয়েছে।' নিষ্ঠুর গলায় বললো করিম।

'তুমি তাহলে একথাই বলতে চাও যে আমি তোমাকে বিপথে চালিত করেছি?'

'খুব সম্ভব।'

'তুমি এ কথা বলতে পারলে! ছি ছি ছি! একটু পরেই হয়তো বলে বসবে, তোমার ধন-সম্পদে মজেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি।'

'অনেক মেয়ের জীবনেই অবশ্য এরকম আশা থাকে,'

'করিম, তুমি কি তোমার প্রতি আমার মনটাকে বিষিয়ে তুলতে চাইছো?'

'তাহলে তো ভালোই হতো !'

'আ— চ্চা— !' দপ্ করে নিভে গেলো লিণ্ডার মুখের ওপরকার শেষ আলোটুকু। সেখানে দেখা দিলো হতাশার ছায়া। ক্লান্ত স্বরে সে বললো, 'আমি বেন্না করলে তোমার অপকর্মের ওপর একটা আবরন সৃষ্টি হতে পারে, তাই না ?'

'তুমি কিছুতেই কথাটা বুঝতে পারছো না লিণ্ডা।' বন্যতা ঝলক দিয়ে উঠলো যেন তার চোখে। 'যদি আরব মেয়ে হতে তাহলে হয়তো বা বুঝতে।'

'এই সত্যটা প্রথমে বুঝতে পারলেই ভালো হতো না ? আমিই তোমাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম স্বজাতির কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে। সেকথায় তখন কান দিয়েছিলেন প্রভু !'

এই মোক্ষম তীরটি জ্যা-মুক্ত করে লিণ্ডা দুম দাম করে হেঁটে এলো নিজের শোয়ার ঘরে। দড়াম্ করে বন্ধ করে দিলো দরজা।

অনেক ক্ষণ পর। বাথরুম থেকে গোসল করে এলো লিণ্ডা। কিছু ভালো লাগছে না তার। অনিশ্চয়তা যেন তাকে জাপ্টে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। এখন সে কী করবে ? তার মন বারবার বলছে, এঘরে আর নয়। নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে কাপড় চোপর পরে একটা পুঁটুলী হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ঘরের ভেতর থেকে। আগের সেই আতিথি-কক্ষে ফিরে যেতে চায় সে।

সরু প্যাসেজের ও পাশে সে দেখতে পেলো সাদা ইউনিফর্ম পরা এক রক্ষীকে। কিন্তু লোকটা এখন পেছন ফিরে আছে। সিগারেট খাচ্ছে। ধোঁয়া দেখে বোঝা যায়। গার্ডের চোখে ধুলো দিয়ে আগের সেই কক্ষে চলে এলো লিণ্ডা। বিয়ের আগে পর্যন্ত সে এই ঘরেই ছিলো। কিন্তু ঘরটা এখন শূন্য। পরিচারিকারাও নেই। সোনালী পোশাক খুলে সে পরে নিলো ভয়েলের সাদাসিধে কাপড়। চুল আঁচড়ালো। মিনারাল-ওয়াটার খেলো কয়েক ঢোঁক। তারপর নিজের ঠাণ্ডা, নিঃসঙ্গ বিছানায় পা এলিয়ে দিলো।

'হে খোদা!' সে হাত তুলে প্রার্থনা জানাল, 'আমার পেটে যেন বাচ্চা না আসে!'

৭

সারারাত ভালো ঘুম হয়নি। যেটুকু ঘুমিয়েছে, কেবল দুঃস্বপ্ন দেখেছে লিণ্ডা। ভোরবেলা পারভীন যখন ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলো, লিণ্ডা মুখখানাকে বেশ খুশি খুশি করে রাখলো। কিন্তু পারভীনের জিজ্ঞাসু-মন তাতে তৃপ্ত হয়নি। বিয়ের রাতে দু'জন দু'ঘরে থাকাটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার।

পারভীন শুকনো গলায় বললো, 'কফি এনেছি লেল্লাহ!'

'লক্ষী মেয়ে!' লিন্‌ডা বিছানার ওপর উঠে বসলো। বাইরে ঝলমল করছে সকালের আলো। জানালার পর্দাটা যেন রোদে ভেসে যাচ্ছে। বড্ড গরম। লিণ্ডা কফির পেয়ালা হাতে তুলে নিলে পারভীন তার এলোমেলো বিয়ের পোশাক গোছাতে বসলো। নেকলেসটা লিন্‌ডা শেখের শোবার ঘরেই খুলে রেখে এসেছে। বিছানার ওপর রেখে দিয়েছে সোফিয়ার দেয়া তাবিজ। টুলের পাশেই দেখা যাচ্ছে পারভীনের নীল চপ্পল। পারভীন যখন পোশাক গোছাচ্ছে, সোফিয়া এসে ঘরে ঢুকলো। ওর মুখে ছিলো মৃদু হাসি। কিন্তু এ ঘরে পা দিয়েই মনটা খচ্ করে উঠলো তার। কী যেন একটা হয়ে গেছে। আর এ ঘরে তার স্বাক্ষরও সে দেখতে পাচ্ছে। মুখের হাসি সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেছে সোফির।

'পোশাকটা কুঁচকে গেছে বলে আমি দুঃখিত।' লিণ্ডা বললো। 'আবার ইস্ত্রি করে নিলেই হবে। তোমার তাবিজ আর চপ্পল জোড়া না দিলে যে কি অসুবিধে হতো? বাবা, ভাবা যায় না।'

মুখে এসব কথা বললেও লিণ্ডার মন ভাবছিলো, এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা। বিদেশ বিভুঁইয়ের এ বন্দীশালা ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার কথা। সে জানে না, কিভাবে তার এ আশা ফলবতী হবে। তা না জানলেও সে বদ্ধপরিকর এই যে এই নিরানন্দ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে উদ্ধার না

করলেই নয়। বিচিত্র নগরীর ততোধিক বিচিত্র বাজারে গেলে কেমন হয়। করিম তো নিজেই সেদিন বলেছিলো। করিমকে অবশ্য এ ব্যাপারে সে জিজ্ঞেস করতে পারে। সম্পর্কটা তো এখনো সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যায়নি। বাইরের লোক—এমনকি এই ভবনে কর্মরত লোকগুলোও জানেনা দু'জনের ভেতর কী প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে। কেউ কেউ সন্দেহ মাত্র করতে পারেনি। অনেকে ব্রিটিশ বউয়ের অন্যরকম আচার-আচরণ হিসেবে ব্যাপারটাকে নিজেদের মতো করে বুঝে নিয়েছে।

সুখ, তুমি কোথায়? মনে মনে এই কথাটি উচ্চারণ করে লিণ্ডা। স্পেনে ফিরলে ভালো লাগবে। কিন্তু সেখানেও তো যেতে হবে করিমেরই পাশে বসে? করিম তো তাকে আর যাই-ই দিতে পারুক, সুখ দিতে পারবে না। তাছাড়া এই অঘটনের জন্যে নিজেকে দায়ী করাটাও সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে কেন দোষী হবে। দোষী তো তার মা মরিয়মও নয়। হতে পারে তার মা নিষ্ঠুর, অবিবেচক, কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে জড়ালে তো ঈশপের সেই নেকড়ের গল্পটাকে আবার নতুন করে লিখতে হয়।

লিণ্ডা গোসল করছিলো, হঠাৎ স্নানাগারে এসে ঢুকলো করিম। এখানে আসার আগে সে কোনো রকম গলাখাকরিও দেয়নি। একদম আচমকা ঢুকে পড়েছে। পারভীন শরীর মার্জনা করছিলো লিণ্ডার। হঠাৎ স্বামীকে স্ত্রীর কাছে আসতে দেখে সালাম জানিয়ে চম্পট দিলো সেখান থেকে।

'সুপ্রভাত!' করিম স্বাভাবিক গলায় বললো, 'কয়েকটা কথা ছিলো তোমার সঙ্গে।'

'আমি জানি।' লিণ্ডা বিব্রত হলেও কোনোমতে কথাকটা বললো। সে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বসে ছিলো বাথটাবে। কি করবে ভেবে পেলো না। সমাধান করলো তখন করিমই। সে হ্যাঙ্গার থেকে তোয়ালে এগিয়ে দিলো লিণ্ডার দিকে। লিন্ডা সেটা গায়ে জড়িয়ে নিলো সঙ্গে সঙ্গে। তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে।

কাপড় পাল্টে সে চলে এলো পাশের ঘরে অল্পক্ষনের মধ্যেই।

'কী বলবে বলো, করিম।'

'আমাদের হাতে এখন পুঁজি এই একটাই। কথা বলা। তা, তুমি সময় নিয়ে, একটু ভালোভাবে পোষাক পরে ধীরে সুস্থেই আসতে। এতো তাড়াহুড়োর কি দরকার ছিলো বলোতো?'

'আমি ভালোভাবেই পোষাক পরেছি করিম। এটা তুমি বার্সিলোনায় গিয়ে নিজের হাতে আমাকে কিনে দিয়েছিলে।'

'তা, হ্যাঁ---এ পোশাকটিও মন্দ নয়। আসলে আমি তোমাকে এমন পোশাক পরাতে চাই, যা কম যন্ত্রণাদায়ক।'

'যেখানে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা বলা ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানে আমার যন্ত্রণা বাড়লে বা কমলে তো কারো কিছু আসে যায় না।'

'রাখো তোমার তত্ত্বকথা!' রাগত গলায় করিম বললো।

'বাহ! চালিয়ে যাও থামলে কেন করিম। আমাকে আঘাত করো। তাতে যদি তোমার মন থেকে আমার নারী সত্তাটি মুছে যায়?'

কথার জবাবে সজোরে এসে ওর দু'হাত ধরলো করিম। তারপর বুকের মধ্যে চেপে ধরে পাগলের মতো চুমো খেতে লাগলো। লিন্‌ডা হাত পা ছুঁড়ে বাধা দিলেও তেমন ফল হলো না। যেন ঘুমন্ত মরু-বিড়াল জেগে উঠেছে হঠাৎ। কোনো বাধাই সে মানবে না। করিম কাগজের মতো ছিড়ে ফেললো লিন্‌ডার ভয়েলের জামা। তারপর বিছানায় শোয়ালো চিৎ করে।

প্রচন্‌ড রাগ কর্পূরের মতোই মিলিয়ে গেছে লিন্‌ডার। আবেগে রুদ্ধশ্বাস হয়ে শীৎকার ধ্বনি করছিলো সে থেকে থেকে। কোথা থেকে কি হয়ে গেলো। বুঝতে পারলো না সে। ঝড় অবশ্য থেমে গেলো এক সময়।

'নিষিদ্ধ!' ব্যঙ্গভরে বললো লিন্‌ডা।

'নিষিদ্ধ ফলের অর্থ তো জানো!' লজ্জামাখা গলা করিমের।

'যাত্রা দলে নাম লেখালে ভালো করতে।'

'তুমি মুণি ঋষিদেরও ধ্যান করতে দেবে না।'

'তুমি নিজেও তো একজন ঋষি, তাই না করিম।'

খালিদ একটা চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো এক গাল। কথায় জোরে লিণ্ডার সঙ্গে পারছে না সে আজ। লিণ্ডা যেন ছুরির ফলা। বারবার ঘা দিচ্ছে। করে দিচ্ছে ক্ষতবিক্ষত।

'আমি তোমাকে এখানে রেখেছি।' করিম বললো, 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে। তোমাকে ছাড়া আমার চলছেও না।'

'এ আবার কেমন কথা?' লিণ্ডা হতাশ হয়। 'তাহলে আমাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দাও।'

'আমরা দুজনেই জানি, এটা সম্ভব নয়। আমি তা পারব না।'

'কেন পারবে না। আমাকে দেখলেই তো তোমার রাগ হয়।'

'কেন যে পারবো না, তা তুমি জানো।'

'বেশ তো ম্যাজিশিয়ানের মতো কথা কইছো। কাল রাতে এই ম্যাজিক কোথায় ছিলো? ঝোপ বুঝে কোপ মারতে বেশ তো শিখে ফেলেছো দেখছি।'

'দ্যাখো লিণ্ডা, জন্ম আমার মরুভূমিতে। আত্মরক্ষার উপায় গুলো অভিজ্ঞতা থেকেই শিখি আমরা। কিন্তু আমিও তো মানুষ। পাথরের মূর্তি নই।'

'আমি তা জানি।' বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠলো লিণ্ডার ঠোঁটে।

সোনার ব্রেসলেটটা পকেট থেকে বের করে আবারো লিণ্ডার কব্জিতে পরিয়ে দিলো করিম। বললো: একটা কথা বলো তো লিণ্ডা। আচ্ছা, তুমি একজন বৃটিশ হয়ে কি গর্বিত?'

'অবশ্যই।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো লিণ্ডা।

'আমি তেমনি গর্বিত আমার আরব-সত্ত্বাটির জন্যে। তুমি ঠিকই বলেছিলে। আমি যতোটা না স্প্যানিশ—তার চেয়ে অনেক বেশী আরব। আমি তোমাকে গ্রহণ করলেও আমার সমাজ যখন জানবে, তুমি শত্রুদের মেয়ে তখন সমাজকে আমি ঠেকাতে পারবো না। আমাদের বিয়ের আসরেই তুমি তাদের দেখেছো। একবার ওরা যদি তোমার বংশ পরিচয় জেনে যায়, তখন তোমার প্রাণ রক্ষাও কঠিন হয়ে পড়বে। তুমি কাল দেখেছো সেই যুদ্ধবাজ গোত্রের লোকগুলোকেই। কি করবো বলো। ওদের সঙ্গে আমার ব্যবসা-বানিজ্যের সম্পর্ক। ওরা তোমার গায়ের চামড়া দেখেই আপত্তির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিলো। আমি অনেক বুঝিয়ে ওদের আশ্বস্ত করেছি। এখন যদি সামান্য একটু ভেতরের খবর বাইরে প্রকাশ পেয়ে যায়, ওদের আর নিরস্ত রাখা সম্ভব হবে না।'

'তাহলে আমার কি হবে, শেষ পর্যন্ত ?'

'আপাতত স্পেনে ফেরা যাক তো।'

'কিন্তু এই ফেজ নগরীটা ঘুরে ঘুরে দেখতে চেয়েছিলাম যে আমি। তুমিও তো বাজার দেখতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে।'

'তোমার ভয় করে না ?'

'ভয় তা একটু করে বৈকি। তবে আমি ভীরু নই। ভীরু হলে কি আর তোমার বউ হতে পারতাম ?'

একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো করিমের ঠোঁটে।

'একটু আগের দুর্ব্যবহারের জন্যে রাগ করোনি তো? রাগ করলে ক্ষমা করে দিও।'

'আমি কি তোমাকে তিরস্কার করেছি?'

'কি জানি। তোমার কাছে এলে আমার ভদ্রতাজ্ঞান থাকেনা।'

'তুমি কোনোদিন ভদ্রলোক ছিলে নাকি। কই। জানতাম না তো।' লিণ্ডা হেসে উঠলো।

'তুমি যে আমাকে কি ভাবো, তা খোদা জানেন। তুমি আমাকে অন্ততঃ মানুষ বলেও মনে করো কি?'

'বারে! আমি তোমাকে কি মনে করলাম, তাতে কি তোমার খুব একটা কিছু আসে যায়? তুমি খোড়াই পরোয়া করো আমাকে।'

'সে হিসেব পরে হবে।' করিম লিণ্ডার হাত ধরলো খপ্ করে। বললো, চলো, আগে লাঞ্চটা সেরে নেয়া যাক।'

দিনের আলোয় বাড়িটাকে বেশ ভালোভাবে দেখতে পেলো আজ লিণ্ডা। মরুভূমি শুরু হয়েছে ঠিক এই বাড়িটার পর থেকেই। বিশাল মরুভূমি সূর্যালোকে হলুদ মনে হচ্ছে। বাতাসে বিশুদ্ধতা যেমন, তেমনি আছে ভীতির ঘ্রাণ। বাতাস অর্থাৎ পরিপার্শ্ব। ওপরে আকাশ ঝকঝকে নীল। হঠাৎ বহু দূরে মরুভূমির বুকে এক সারি উট দেখে লিণ্ডার মনে হলো, চমৎকার একখানা ছবি এই মাত্র এঁকে শেষ করলেন কোনো সুদক্ষ শিল্পী।

'সত্যি, অতুলনীয়।' বললো লিণ্ডা। 'করিম আমি এখানেই থাকতে চাই। তুমি তোমার মত বদলাতে পারবে না?'

'হে নারী, আমি কখনো মত বদলাই না।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো লিণ্ডা। লাঞ্চ তৈরী ছিলো। খেয়ে নিলো ওরা। বরাবরের মতোই সুস্বাদু সব পদ। বাটার বীন সুপ, আলু, মাংস আর রসুন দিয়ে বানানো সেই দারুন চপ-গুলো। লাঞ্চের পর হালকা সুরার গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে করিম বললো, 'ঘোড়ায় চড়া শেখার কথা ভুলে গেছো নাকি তুমি?'

'না তো।' গ্লাসের ওপর হাত চাপা দিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে লিণ্ডা বললো, 'তোমার পাশাপাশি ঘোড়া নিয়ে ছুটবো সে তো আমার কতোদিনের শখ। বিশেষ করে রাতের বেলা। যখন মরুভূমি থাকবে ঠাণ্ডা, আকাশে ঝিকমিক করবে তারা।'

'তা, তারা উঠবে অজস্র। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' করিম বললো, 'কিন্তু তার আগে যে উরু জোড়া শক্তপোক্ত করতে হবে বেগমসাহেবাকে। চাকরানিদের বলবে, দু'বেলা যেন তারা তোমার উরু ম্যাসাজ করে দেয়। ঘোড়ায় চড়া চাট্টি-খানি কথা নয়। সে যাই হোক, যে কথাটা প্রায়ই বলতে চাই, কিন্তু বলা হয়না, আচ্ছা, তোমার চুলগুলো এতো সুন্দর হলো কি করে? অ্যাংলো স্যাক্সেন চুল বুঝিবা একেই বলে?'

'আমার দাদার চুল ছিলো সোনালী। দাদার কথা তোমাকে

তো বলেছি। মার চুল ছিলো দাদার চেয়ে চমৎকার।'

'তোমার ইংল্যাণ্ডের আত্মীয়-স্বজনরা শিগগীরই খবর পাবেন যে, তুমি শেখ-গিন্নি হয়ে গেছো।'

'হ্যাঁ।' করিমের চোখের দিকে তাকালো লিণ্ডা। ওকে যেন কেমন সুদূর বলে মনে হয়। 'আমাকে বিয়ে করে তুমি কি বড়ো রকমের দুঃখ পেয়েছো? ধরো, সত্যি সত্যি যদি আমার বাচ্চাকাচ্চা না হয়, তাহলে তুমি কি করবে? বলো করিম। খুলে বলো আমাকে। লুকোবার কোনো দরকার নেই।'

'বোধহয় আমাদের বন্ধন অটুট থাকবে। যাতে গভর্নেসের চাকরী নিতে নাহয় সেজন্যে তোমার নামে লিখে দেবো প্রয়োজনীয় সম্পত্তি। আমি শপথ করে বলছি, তুমি পরম নিশ্চিন্তে তোমার সঙ্গীত চর্চা চালিয়ে যাবে।'

'তাই নাকি?' লিণ্ডা বুঝতে দিলো না, করিমের এই সুসংবাদ তাকে কতোটা আহত করলো। মনে হলো একটা তীক্ষ্ণ ধার ছুরি যেন ফালা ফালা করছে একটি মেয়ের সব গুলো গোপন অঙ্গ। এমন বন্ধন কার কাম্য। ছিঃ। ঘৃণায় সারা শরীর রী রী করে ওঠে লিণ্ডার। সুখাদু খাবারগুলো বিষমিষায় উদ্রেক করে। সে ভেবেও পায়না যে, করিম নামক লোকটা সত্যিই সুস্থ নাকি এক ধনাঢ্য উন্মাদ। তার চেয়ে কোনো সম্পর্ক না-থাকা তাদের দু'জনের জন্যেই হবে ভালো। সে ফিরে যাবে এসেক্সেই। সঙ্গে থাকবে এই আরব্যরজনীর স্মৃতি।

তার জীবনে এমন বিস্ময়কর মুহূর্ত, এরকম অবিস্মরনীয় অভিজ্ঞতা আর আসবে না। বাকি জীবনটা তাই সে কাটিয়ে দেবে রোমন্থনে। সূর্য সম্রাটের সুন্দরী হিসেবে গর্বিত থেকে যাবে সারাটা জীবন।

ফলের পাত্রে হাত রেখেছে লিণ্ডা। অলসভাবে নাড়াচাড়া করছে সেগুলো। হঠাৎ কি একটা দেখে এক প্রচণ্ড ভয়ে চীৎকার করে উঠলো সে। কি দেখেছে সে? দেখে, কালো বিদ্যুত-শিখার মতো তার ডানা বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে প্রকাণ্ড একটা কালো মাকড়শা। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দৌড়োতে শুরু করলো সে।

'ফেলে দাও, ফেলে দাও!' আর্তনাদ করছিলো লিণ্ডা। করিম খুব স্বাভাবিক ভাবে তার ব্লাউজের ওপর থেকে মস্ত বড়ো মাকড়শাটাকে কায়দা করে আটকে ফেললো নিজের খালি গ্লাসটার মধ্যে। তারপর বয়ে নিয়ে চললো সেই গ্লাসের মুখে হাতের তালু চাপা দিয়ে। লিণ্ডার তো বিস্ময়ে চোখের পলক পড়েনা।

করিম এসে তার হাতে হাত রাখলেও কাঁপুনি আর কমেনা লিণ্ডার। আর কোনো ভয় নেই, অভয় দেয় করিম। 'তোমাকে কামড় দেবার সময় পায়নি শয়তানটা।'

'ওহ, করিম, ওটা এলো কোত্থেকে বলোতো?'

'খুব সম্ভব ফলের গন্ধ পেয়ে গামলার মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছিলো। এখন বলো দেখি, একটু ভালো লাগছে তোমার?'

দু'হাতে লিণ্ডার মুখখানাকে তুলে ধরে নিজের মুখটা কাছে নিয়ে করিম বললো, 'পুঁচকে মেয়ে কোথাকার। এইটুকুন একটা পোকা দেখে এমন জোরে চেঁচাতে হয় বুঝি?'

'চেঁচাবো না? বলো কি? অমন ভয়ঙ্কর একটা জিনিস। তাকে দেখে ভয় পাবো না। তোমাকেও বলিহারি বাপু। তুমি কি করে হাত দিয়ে ওটাকে পেড়ে ফেললে বলো তো। আমি তো মরলেও ওই নোংরা শয়তানটার গায়ে হাত দিতে পারতাম না।'

'তা অবশ্য পারতে না।' বলতে বলতে ছোট্ট করে লিণ্ডার চুলের ওপর একটা চুমু খেলো করিম। 'শোনো খুকি। গরমের দিনে ওমন দু'একটা পোকা মাকড় বেরোতেই তো পারে। তবে ওর কামড়ে তেমন কোনো ক্ষতি নেই। সামান্য একটু জ্বর হলেও হতে পারে।'

'মরুভূমিকে দূর থেকে কতো শান্তিময় মনে হয়। অথচ সেখানে এরকম ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোও থাকে? তাই না?' লিণ্ডা যেন স্বগতোক্তি করে। তারপর করিমের কাঁধে মাথাটা রেখে সে উঠে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে হেঁটে যায় মিনারের দিকে।

বড়ো ঘরটার মধ্যে ঢুকেই পাখা চালিয়ে দিলো করিম। একটা সিগারেট ধরালো সে। লিণ্ডা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো ঘরের জিনিসপত্র। শোকেসে কতো কিছু সাজানো রয়েছে। শেলফ ভর্তি বই। শিকারের কৃতিত্বের জন্যে পাওয়া ট্রফি।

দেয়ালে অনেক ছবি। ছবির সে খুব সমঝদার নয়। কিন্তু বিষয় বৈশিষ্টের জন্যে সংগ্রাহকের রুচির তারিফ না করে সে পারেনা। সবগুলো ছবিই মরুভূমির। তবে নানা দৃষ্টিকোন থেকে আঁকা। রঙ এমন কাঁচা যে ছবিগুলোকে ছবি মনে হয় না। যেন সত্যিকার মরুভূমির অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে।

বাঘের চামড়ায় মোড়া ডিভানের ওপর বসে চুরুট টানছে করিম। লিণ্ডা তার দিকে তাকিয়ে দেখলো : বাঘ বড়ো রূপবান প্রাণী। তবে এমন এক শিকারী, যার নিজেকেই একসময় শিকারে পরিণত হতে হয়।' বললো করিম আল খালিদ, ভারতের এক পাহাড়ে এটাকে মেরেছিলোম। পাহাড়ী গাঁয়ে খোলা উনুনে রান্না করছিলো একটা মেয়ে। বাঘটা সেই ফাঁকে মেয়েটির ঘর থেকে মুখে তুলে নিয়ে যায় তাদের বাচ্চাটাকে। শোনা যায়, বাঘ আগুন দেখে ডরায়। কিন্তু ওই বাঘটা ডরাতো না। এসো না, আমার পাশে এসে বসো।'

লিণ্ডা বসলো গিয়ে সেই বাঘছালের ডিভানের ওপর। যে বাঘের চামড়ার ওপর বসে আছে, সেই বাঘের মৃত্যু-কাহিনী শুনতে কার না রোমাঞ্চ হয়। অ্যাংকলেটটা সে এখনো পরে আছে বলে অস্বস্তি হচ্ছে খুবই। লিণ্ডা কুশনের ওপর পা রাখলো।

'তুমি যে কোনো ব্যাপারে অমার্জিত কিছুর ছোঁয়া দেখতে খুব

ভালোবাসো, তাই না।' জিজ্ঞেস করলো করিম। বললো, 'আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তুমি শহুরে মেয়েদের মতো গৎবাঁধা শহুরে শব্দে কথা বলোনা।'

'তাই নাকি? তহলে আমি যথেষ্ট মার্জিত নই। কিছুটা গ্রাম্য। অন্ততঃ বিদগ্ধ নাগরিক সমাবেশে? কি বলো?'

'পুরোপুরি।' করিম সঙ্গে সঙ্গে বললো। আঙুল দিয়ে লিণ্ডার পায়ের উপর টোকা দিতে দিতে করিম বললো, 'তুমি কোনো কথা ভালোভাবে শোনোনা। সবটা শোনার আগেই রি-অ্যাকট করো। এটা ঠিক নয়। যেমন ধরো, তুমি যখন কাউকে চুমু খাবে, তখন চুমোই খাবে, আবার যখন কাউকে আঘাত করবে তখন আঘাতই করবে। বুঝতে পারলে? অথচ আমি জানতাম, ইউরোপের মেয়েরা ঠাণ্ডা, রক্তহীন। অবশ্য তোমাকে দেখে তা মনে করার উপায় নেই। এই রকম মোমের মতোন সাদা, চিকনচাকন মেয়েটার ভেতরে যে এমন রাগ, কে তা বুঝবে?'

'তা, ঠাণ্ডা মেজাজের রক্তহীন ইংরেজ রমনীর সংখ্যা কতো হবে, বলতে পারো?'

'অনেক।'

'তুমি আমাকে কি দেখে বিয়ে করেছো? আমাকে দেখে তোমার কি সাধুসন্ন্যাসী বলে মনে হয়েছিলো?'

'আদপেই না।' লিণ্ডা কল্পনার নেত্রে বহু রমনীকে চুম্বন করতে দেখলো তামাটে রঙের এই লোকটির গালে।

হঠাৎ লিণ্ডাকে কাছে টেনে নিলো করিম। তার নরম হাতটা রাখলো নিজের মুখের ওপর। যেন মনের কথা বুঝতে পেরেছে সে। লিণ্ডা একটা সুগঠিত তামাটে মুখের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে কেমন রোমাঞ্চ অনুভব করলো। ইচ্ছে হলো, এক্ষুণি লোকটার মুখে আর বুকের ওপর চুমোর পর চুমো খায়। যা ভাবা, সেই কাজ। হঠাৎ পাগলের মতো করিমের গালে, নাকে, ঠোঁটে, কাঁধে আর বুকে চুমু খেতে লাগলো লিণ্ডা।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশাল বেডরুমে দেখা গেলো লিণ্ডা আর করিমকে। তারা দুজনই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। দুজনের মুখেই অনিন্দ্য সুন্দর এক ধরনের হাসি। করিমের বুকের লোম টানতে টানতে লিণ্ডা বললো, 'যেন বাঘের চামড়া, তাই না?'

আবেশে চোখ মুঁদলো লিণ্ডা।

দশ বছরের নিঃসঙ্গ মেয়েটি এখন অনেক বড়ো হয়েছে। সে এখন পূর্ণ বয়স্কা রমনী। যৌনতার পূর্ণ আনন্দ একটু একটু করে পান করছে সে।

'সে কখনো আমাকে দূরে ঠেলে দেবেনা।' নিজেকে নিজে বললো লিণ্ডা, বিড়বিড় করতে লাগলো, 'ওর মতো এমন করে কে আর আমাকে ভালোবাসবে? কেউ না, কেউ না, আমিও আর কাউকে এমন করে ভালোবাসিনি। বাসবোও না।'

'আমার বুনো পাখি। আমার দুষ্টবাজ।' ফিস ফিস করে করিম বললো।

'ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো!' ক'কিয়ে উঠলো লিণ্ডা। তার-পর যেন দুজনে দুটি বাজপাখির মতো উড়ে চললো প্রাচীন আলো ভরা সন্ধ্যার আকাশে। দিকচক্রবাল রেখায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রক্তিম পরিপূর্ণ হয়ে আলোয় ভরে গেছে পুরো ঘরটা।

৮

জ্যোৎস্না ধারায় যেন প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে মরু-প্রকৃতি। পাহা-ড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিয়েছে চাঁদ। বাতাসও আসছে সেই দিক থেকেই। পাহাড়টাকে দেখে গা ছম ছম করে। ঠিক যেন মরুভূমির প্রাচীন দেবতা দাঁড়িয়ে আছে।

মরুবালুকায় চন্দ্রালোক পড়ে সৃষ্টি হয়েছে আলোর সমুদ্র। উঁচু নিচু জায়গায় আলো-ছোয়ার আলপনা একেঁ দিচ্ছে রাতের বাতাস। সারা দিনের উত্তাপের পর, রাতের এ বাতাস যেন আশীর্বাদ করে দিচ্ছে লিন্‌ডার মাথায়, মুখে হাতে। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে সে করিমের সঙ্গে। ছাত্রী হিসেবে শিক্ষককে খুশি করতে পেরেছিলো সে সেই প্রথম দিনেই। সাবরিনা নামের ঘোটকির পিঠে চড়েছে লিণ্ডা। তার গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। মাথায় আর গলার কাছে কালোর ছিটে। করিমের ঘোড়াটা কালো। নাম মালিক।

আগে আগে দৌড়ে চলেছে। তার পেছনে সাবরিনা। প্রথমে হাত ধরে লিণ্ডাকে সাবরিনার পিঠে চড়িয়ে দিয়েছে করিম। তারপর থেকেই লিণ্ডা দিব্যি বসে আছে। কোনো অসুবিধা হচ্ছেনা তার।

পাঁচ সপ্তাহ প্রশিক্ষণ নেবার পার আজ প্রথম বাইরে বেরিয়ে খুব একটা অস্বস্তি বোধ করছে না তো লিণ্ডা।

'রাতের মরুর এ সৌন্দর্য আমাকে কোনো দিনও পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারবে না।' বললো লিণ্ডা।

করিম পেছন ফিরে মৃদু হাসলো।

'আমারও খুব ভালো লাগে রাত-বিরেতে এরকম ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে। তুমি ঠিকই বলেছো লিণ্ডা। মরুভূমি সুন্দর, রাতের মরুভূমি আরো সুন্দর। তারাগুলোর দিকে তাকাও। এমন কি চাঁদও পারেনি তাদের উজ্জলতা ম্লান করতে।' বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ঠাণ্ডা নেমে এলো। আশ্চর্য এক শীতলতা। করিম বললো, 'অনেক হয়েছে। চলো, এখন ফেরা যাক।'

পাহাড়ের খাদের ধার ঘেঁষে ফিরছিলো ওরা। ঘোড়া থেকে হঠাৎ নেমে পড়লো দু'জন। শান্ত ঘোড়া দুটোর বিশ্রাম দরকার। করিম একটা সিগার ধরালো। চমৎকার ঘ্রাণে ভরে উঠলো রাতের বাতাস। এই ঘ্রাণ বড়ো ভালোবাসে লিণ্ডা। ঠিক ওই মানুষটার মতোই। ভাবে লিণ্ডা। মনটা হঠাৎ তার দমে যায় একই মানুষের অন্য রকম আচরনের কথা মনে

করে। কী যে হয় সময় সময়। দু'জনের মাঝখানে যেন এসে দাঁড়ায় একটা ভূত। সেইই বাঁধিয়ে দেয় গণ্ডগোল। শুরু হয় অশান্তি।

নিঃশব্দে চুরুট খাচ্ছিলো করিম। কী যেন ভাবছিলো ও খুব গভীরভাবে। হঠাৎ ভারী গলায় বললো, 'কালকে আমি রাবাও যাচ্ছি। সেখানে শেখদের একটা সম্মেলন হচ্ছে। তোমাকে সপ্তাহ খানেক একা থাকতে হবে। আচ্ছা বলোতো তোমার কি ফেজে থাকতে ইচ্ছে হয়? নাকি স্পেনেই ফিরতে চাও তুমি? আমি সেখানেও তোমার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে পারি সম্মেলন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে।'

'আমি স্পেনে যাই, তা কি তুমি চাও?' বুটের ওপর হাতের ছড়ি দিয়ে টোকা মেরে জিজ্ঞেস করলো লিণ্ডা।

'সেটাই বোধহয় ভালো হবে।' বললো করিম। 'তাছাড়া তুমি তো জানোই, কেন আমি তোমকে রাস ব্লাংকায় একা রেখে যেতে চাই না?'

'আমি নার্ভাস নই করিম। এই ফেজ জায়গাটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। একটা সপ্তাহ তো? দিব্যি কেটে যাবে।'

'তবে তাই হবে।' রাগত স্বরে বললো করিম। 'আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে। কে জানে এই মরুভূমি তোমার রক্ত পান করতে চায় কিনা। আশ্চর্য রমনী বটে তুমি। আমি এরকমটি আর কখনো দেখিনি।' একটু পরে নরম গলায়

বললো, 'বাড়িতে তো পিয়ানোটা আছেই। তবে আর চিন্তা কি? স্বামীর বিরহ ব্যথা ওইই উপশম করবে।'

'না ওস্তাদ! আমি শ'পা বাজাবো একেবারে মনপ্রাণ তার পায়েই ঢেলে দিয়ে।' হেসে বললো, 'তুমি যে আমার কতো-খানি, তা অল্প কথায় বলে বোঝাতে পারবো না করিম। অমন চমৎকার পিয়ানোটা তো তুমিই জোর করে কিনেছিলে সেই বার্সিলোনায়। যেটা পরে জাহাজে করে আনতে হয়েছে এখানে। বেকস্টাইনের মতো পিয়ানো সত্যিই আর হয় না।'

'আমি একা একা তোমার বাজানো শুনতে চাই। পিয়ানো হচ্ছে এমন এক বাদ্যযন্ত্র যা একজন বাজাবে একজনই শুনবে। তোমার চেলো বাজাতে তো বেহালাবাদকই লাগে ডজন খানেক। শ্রোতার সংখ্যাটা আর বললাম না।'

'তোমার জন্যে নিশ্চয়ই আমি একটা সময় করে নেবো।' লিণ্ডা বললো।

সকালে ঘুম থেকে জেগেই লিণ্ডা শুনলো, করিম রাবাত রওয়ানা হয়ে গেছে। বাইরে চড়া রোদ। লিণ্ডার মনটা কেমন একাকীত্বে ভরে উঠলো। তার ইচ্ছে ছিলো, বিদায়ের আগে একটু চুমুক দিয়ে দেবে। বালিশের সঙ্গে পিন্ দিয়ে গাঁথা চিঠিটা পড়লো লিণ্ডা। 'অনাহার শুরু হলো। আশা করি সময় হলে দুজন আবার একসঙ্গে আহার করবো।'···কাগজের টুকরোটায় চুমু খেলো লিণ্ডা। বিড়বিড় করে বললো, 'অথচ

এই মানুষ মুখ খুলে কখনো ভালোবাসা শব্দটা উচ্চারণ করবে না।'

সে শতমুখে তার চুলের প্রশংসা করে। চামড়ার বন্দনা গায়। তার দেহ গঠনের নৈপুন্যের জন্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে নতজানু হয়। কিন্তু নিজের হৃদয়ের দুয়ার কখনো খুলবে না কারো কাছে। আমন্ত্রন জানানো দূরের কথা। সে কখনো স্বীকার করতেই চায় না যে, তাদের সম্পর্ক দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছু।

ছোট্ট চিরকুটটা একখানা ছোট্ট সোনার বাক্সের মধ্যে ভরে রাখলো লিণ্ডা। ভাবলো সোফিয়া আর পারভীনকে সঙ্গে নিয়ে সে বাজারে বেড়াতে যাবে। ওদের কথা ভাবতে না-ভাবতেই ওরা সামনে এসে হাজির। একজন এনেছে ব্রেকফাষ্ট, অন্যজন সদ্য-ধোয়া রাইডিং শার্ট। লিণ্ডা খোঁশ-মেজাজে ওদের জানালো যে এবার ওদের সঙ্গে তাকে শহরে বেরুতে হবে। তার একটু খানি হাত দেখাতে হবে জ্যোতিষীর কাছে। 'আমার মনে হয়, এই আশ্চর্য দেশের গুনী গনকরা আমার ভাগ্যের লিখন হুবহু বলে দিতে পারবে!' বললো লিণ্ডা।

সোফিয়াকে কেমন বিব্রত মনে হলো একথা শোনার পর। কিন্তু সে কোনো কথা বললো না। কিছুক্ষণ পরেই তারা তিনজন বড়ো গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে পড়লো বাইরে। তিন-জনের পরনেই কালো বোরখা। এমন কি গাড়ির জানালাতেও পর্দা লাগানো। শহরের একটা জায়গায় গিয়ে ড্রাইভারকে

থামাতে বললো লিন্‌ডা। গাড়ি দাঁড়াবার পর ওরা তিনজনই নেমে গেলো। ড্রাইভারকে বলে গেলো এখানেই গাড়ি নিয়ে থাকতে।

বোরখার আড়ালে খুব হাসছিলো লিন্‌ডা। একজন শেখের স্ত্রী হওয়ার মধ্যে বেশ এক ধরনের উত্তেজনা আছে। ভাবলো সে। রাস্তাগুলো সংকীর্ণ। বাড়িগুলো যেন পথের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বাড়িগুলোর নিচ তলায় কোনো জানালা নেই। মেয়েরা বোরখা পরে চলাফেরা করছে। কিছু মেয়ে খুব সুন্দরী? তবে পাহাড়ী মেয়েগুলোর চেহারা যেন কেমন বন্য। অনেকটা তার স্বামীর মতো। স্বামীর চেহারা যাই হোক স্বভাবের বন্যতা স্পষ্টই বোঝা যায়। ওর বাবা ছিল আরো খানিকটা অমার্জিত স্বভাবের। আর জন্মও হয়েছিলো তার এই শহরটিতেই। পাহাড়ীগুলো বেশ গোয়াড়। সাহসও খুব। দামী বোরখা পরা তিন রমণীকে দেখে রাস্তার পাশের দোকানীরা হৈ হল্লা করে ওঠে। নিজ নিজ দোকানের জিনিস পত্রের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে থাকে তুমুল উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু ভালো একটা সেন্ট কিনতে গিয়ে ঘাম ছুটে গেলো ওদের ঘুরতে ঘুরতে। যাই হোক, টুকটাক কেনাকাটা শেষ হলে লিন্‌ডা বললো, 'কই তোমরা আমাকে জ্যোতিষির কাছে নিয়ে যাবে না?'

'আপনি হুকুম দিলেই নিয়ে যাই।'

'ওদের সম্পর্কে কি মনে হয় তোমাদের?'

'সাংঘাতিক মানুষ ওরা। সবকিছু বলতে পারে।' জালের ফাঁক দিয়ে লেল্লাহর দিকে তাকালো সোফিয়া। বললো, 'মানুষের ভূত ভবিষ্যত সবকিছু ওদের নখ-দর্পণে।'

এইসব জ্যোতিষীদের ওপর তার নিজের কতোটা বিশ্বাস, লিণ্ডা সে ব্যাপারেই সন্দিহান আছে। তবুও ভাবলো, দেখাই যাক না এই মরু গণকদের কেরামতি। তারা তো এমন কথাও বলতে পারে যে, তোমার জন্যে বেহেশত থেকে সুখ শান্তির নহর নেমে আসছে!

বিচিত্র ধরনের বাজারের ভেতর দিয়ে ওরা এগিয়ে চললো। পথে বেশ কিছু ইউরোপীয় টুরিস্টও দেখলো ওরা। তারা রাস্তায় বোরখা পরা মেয়েদের চলাফেরা দেখছে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে। লিণ্ডার মনে হলো, এখন যদি ওদের সামনে গিয়ে সে নিজের মুখের নেকাবটা সরায়, ওরা সগোত্রের লোক দেখে সত্যি খুব চমকে উঠবে। বেগম সাহেবের উল্টোপাল্টা কথা শুনে ধাঁধা লেগে যায় পরিচারিকা দুজনের। ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারলে হয় একবার। আর এমুখো হবে না। মনে মনে শপথ নেয় ওরা। চাকরিটা থাকে কিনা কে জানে। তবে সবচেয়ে বেশি অবাক হয় ওরা, লেল্লাহ যখন বাচ্চাদের একটা পোশাক কেনে। চমৎকার পোশাকটি ব্যাগে ভরতে ভরতে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিণ্ডা বলে, দেখেছ, 'কি দারুণ পোশাকটা।' মুখ চাওয়া চাওয়ি করে সোফিয়া আর পারভীন। মাথা ঠিক আছে তো বেগম সাহেবার। কথা-

বার্তা তো কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে। এই যেমন একটু আগেই বলে উঠলেন, 'বাচ্চা নেই, তো কি হয়েছে। বাচ্চা হতে কতক্ষণ। জ্যোতিষীর কাছে যাচ্ছি। সে হয়তো বললো, ওরে তোর আধা-ডজন বাচ্চা হবে। তখন? তখন আমি বাচ্চাদের পোশাক কোথায় পাবো বলো। তাই তো, কিনে রাখছি আগে থেকেই।'

সারা বেলা বাজারে ঘুরে ধুলি ধুসরিত লিন্‌ডা বললো, 'অনেক হয়েছে। চলো এবার হাত দেখাবো।' কার্পেট স্কোয়ারের দিকেই পাওয়া গেলো এক জ্যোতিষীকে। সোফিয়া সব কথা খুলে বললো তাকে। বললো, তার বেগম সাহেবা এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে। তিনি আরবের মাটিতে ভাগ্য গণনা করতে চান।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

৯

প্রাচ্যের বিজ্ঞ জ্যোতিষী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো লিন্‌ডাকে। তারপর খসখসে গলায় সোফিকে কিছু বললো। লিণ্ডা সে ভাষার কিছুই বুঝলো না। তার কেবল মনে হলো, রাস ব্রাংকার সান বাঁধানো চত্বরে বাতাস বইলে শুকনো পাতা

ওড়ার যে শব্দ হয়, জ্যোতিষীর কথাগুলোও ঠিক সেই রকম।
সোফিয়া লিন্‌ডার দিকে ঘুরে জানালো, জ্যোতিষী তার সম্পর্কে কি বলেছে, সোনালী চুলের মেয়েদের হাত দেখতে সে খুব ভালো বাসে।
তাজ্জব বনে গেলো লিণ্ডা।
বোরখায় ঢেকে আছে আপাদমস্তক। গনক কি করে জানলো, তার মাথায় সোনালী চুল?
'কীভাবে বুঝলো, বলো তো!'
'কেন গণনা করে!' বললো সোফিয়া। তারপর স্প্যানিশে বললো, 'তাহলে জ্যোতিষী কি গণনা করবে?'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় গণনা করবে।' বললো লিণ্ডা। পাহাড়ের মতো বয়স আর প্যাঁচার মতো বুদ্ধি নিয়ে সে নিশ্চয়ই অনেক কিছুই বলতে পারবে। যা কিছুই বলুক না কেন, মজা তো হবে খানিকটা!
জ্যোতিষী কাজের ফরমাস পেয়ে ব্যাগ থেকে বের করলো এক দলা বালি। লিন্‌ডাকে বললো ডান হাতের তর্জনী ওই বালির ওপর রাখতে। লিন্‌ডা কথামতো কাজ করলো। জ্যোতিষী সামনে পিছে দুলতে লাগলো সমানে। দু'চোখ বন্ধ।
কিছুক্ষণ পরেই সে দু'চোখ বড়ো বড়ো করে লিন্‌ডার দিকে তাকালো। বিড় বিড় করে যেন বললো দুর্বোধ্য ভাষায়। লিন্‌ডা সোফিয়াকে তাগাদা দিলো, এর ভাবানুবাদ করার

জন্যে। সোফিয়া ভয়ার্ত স্বরে বললো, 'মন্ত্র পড়া বালু বুড়োকে বলেছে যে, ওই বিদেশী মেয়েটি শিগগীরই এই মরু-ভূমি পাড়ি দেবে। সে উড়ে যাবে পাখা মেলে। বিদ্যুতের গতিতে।'

'কী সব আবোল তাবোল।' লিন্‌ডা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো। 'কী দেখেছে, ওকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে বলো।'

সোফিয়া বুড়োকে সেকথা বলতেই বুড়ো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বালুর দলাটার আকার বদলালো আঙুলে টিপে। এর অর্থ কিছুতেই বুঝতে পারলো না লিন্‌ডা। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে সে কোথায় যাবে। পাখা টাখার অর্থই বা কি?

শোনা গেলো, ভ্রমণের সময়, তার কোনো ছায়া পড়বে না। কেননা আত্মাই কেবল তার সঙ্গে যাবে।

'কিন্তু আমি যাচ্ছিটা কোথায়?' লিণ্ডা জানতে চাইলো।

'জ্যোতিষী বললো যেখানে মরুভূমির বালু পৌঁছাতে পারেনা।'

'ওহ—উদ্ভট কথার প্রকাণ্ড স্তূপ একটা।' বিড় বিড় করে বললো লিন্‌ডা। সোফিয়াকে লক্ষ্য করে বললো, 'ওকে টাকা পয়সা কি দেবে দিয়ে দাও তো। যথেষ্ট হয়েছে। চলো, বাড়ি ফিরতে হবে। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে।'

রাস ব্লাংকায় ফিরে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলো লিণ্ডা। কিন্তু মনটা তার ভালো না। করিমের অনুপস্থিতি বড়ো কষ্ট

দিচ্ছে তাকে। বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে নিজেকে। বিয়ের দিনের কথা মনে পড়লো তার। ঠিক ওই খানটায় আরবী পোশাক পরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলো করিম।

নিঃসঙ্গতা কাটাবার ইচ্ছায় পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসলো লিন্‌ডা। জর্জ গ্রেশউইনের রোমান্টিক মিউজিক বাজাতে শুরু করলো সে। গ্রেশউইন অনেকটা সেকেলে হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু খাঁটি শিল্পী। বিশেষ করে 'দ্য ম্যান আই লাভ' এর তো তুলনা হয়না।

র‍্যাপসডি ইন ব্লু—ও বাজালো লিণ্ডা। অনেকক্ষণ যাবৎ পিয়ানো বাজালো সে একা একা। বিকেলে ঘোড়ায় চড়ে বেরুলো হাইদ সাইদির সংগে। অশ্ব চালনা ওইই শেখাচ্ছে এখন। হাইদ স্প্যানিশ বলতে পারে। কাজেই ওর সংগে কথাবার্তা বলতে অসুবিধা হয়না লিন্‌ডার। করিমের প্রায় সম-বয়েসীই হবে। আর্মিতে গিয়েছিলো একই সংগে। এখন সে করিমের এখানেই চাকরি করে।

সূর্য ডুবে গেছে। আকাশে খেলা করছে কতোরকম রঙ।
'আপনি তো ভালো পিয়ানো বাজাতে পারেন ম্যাডাম। দারুন হাত। আমি শুনেছি।'
'বাড়িয়ে বলার জন্যে ধন্যবাদ।'
'ইউরোপিয়ান মিউজিক আমাদের আরব সঙ্গীত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।' বললো সাইদি। 'কিন্তু আপনি যা বাজান তা

সত্যিই অতুলনীয়।'

'আচ্ছা বাজারের কার্পেট স্কোয়ারে দুপুরের দিকে যে বুড়োটা ভাগ্য গণনা করতে বসে, সে কিরকম জ্যোতিষী ?'

'কে বলবে ? ভাগ্যের হাতে আমরা সবাই এক একটা তাস। ভাগ্য কখন কাকে নিয়ে কীরকম খেলে ?'

'বুড়োটা বেশ কিছু অদ্ভুত কথা বললো। কথাগুলো আমার মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না।'

'পারভীনের মুখ থেকে কিছু কিছু আমি শুনেছি ম্যাডাম।'

'তুমি তাকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলে বুঝি ?'

'আরবরা একটু খুঁৎখুতেই হয়।'

'তাই বুঝি আমার খাস চাকরানীর পেছনে গোয়েন্দা লেগে-ছিলে।'

'ঠিক তা নয় ম্যাডাম। মেয়েটি সুন্দরী একথা ঠিক। কিন্তু আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওর দিকে কখনো আমি হাত বাড়াবো না।'

'আমিও তাই আশা করি।' বললো লিণ্ডা। এবং আজকেই ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলো সাইদিকে। বেশ রূপবান যুবক। সে আবার বললো, 'করিমের সঙ্গেই তো আর্মিতে গিয়েছিলে তুমি, তাই না ?'

'শেখ আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। আমরা দুজন সন্ত্রাস-বাদীকে ধরতে গেছি কোনো গাঁয়ে। আমি একটা ঘরের মধ্যে

পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের একজন আমার দিকে তাক করে দাঁড়ালো পিস্তল। আমাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপবে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের পেছনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন আল খালিদ। তার হাতে ছিলো একখানা ছুরি। একজন আরবের হাতে ছুরি থাকা মানে, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার ম্যাডাম। যাহোক পিস্তলধারী মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্র ফেলে দিলো ঘরের মেঝেয়। তাদের আটক করা হলো সঙ্গে সঙ্গে।'

'আমার স্বামীকে সবাই মনে করে বিশুদ্ধ আরব। কিন্তু নিজেকে সে আধা স্প্যানিশ বলে ভাববেই।'

'আপনার কি ধারনা? কোন দিকটা পছন্দ।'

'আমার আবার কি পছন্দ থাকবে।'

'তাই নাকি। পছন্দ নেই?'

'তা জেনে তোমার কি দরকার বাপু।'

'জানতে চাওয়া আরব মাত্রেরই স্বভাব ম্যাডাম।'

পরদিন সকালে রাস ব্লাংকায় একটি ঘটনা ঘটলো। বলা উচিত, ভাগ্যদেব স্বয়ং লিণ্ডার অদৃষ্টের দিকে লক্ষ্য করে একটা চাল চাললেন। বাজার থেকে কিনে আনা নকশি করা বেল্টটা সে স্বামীর ঘরে রাখতে গেছে। নীল একটা শার্ট হাতে লেগে

পড়ে যেতেই তার পকেট থেকে ভাঁজ করা কিছু কাগজ পড়ে গেলো মেঝেয়। কাগজগুলো ছিলো একটা খোলা খামের মধ্যে। লিণ্ডা কাগজগুলো কুড়িয়ে নিলো আড়ষ্ট হাতে। এবং ভালোভাবে নজর বোলাতেই মাথাটা ঘুরে গেলো ওর। একি? এ যে তার পাশপোর্ট। তার ভিসার কাগজপত্র।

মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলে গেলো তার। এই বুঝি তার কাগজপত্র সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যাবার নমুনা? করিম এতো বড়ো মিথ্যাবাদী!

এক কাপড়ে, স্রেফ সেই হারানো ব্যাগ খানা নিয়েই রাস ব্লাংকা থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে লিণ্ডা। দেশে ফেরার প্লেন ভাড়ার জন্যে দুশ্চিন্তা নেই। হাত ব্যাগের ভেতর লিণ্ডার যে টাকা-গুলো ছিলো তা, আগের মতোই আছে। সেই টাকায় সে টুকিটাকি কেনাকাটা সেরেও দিব্যি সাসেক্সে গিয়ে পৌঁছতে পারবে।

মাথাটা টন টন করছে লিণ্ডার।

করিম যে তার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। আসুক, রাবাত থেকে ফিরে এসেই সে দেখবে, পাখি পালিয়েছে।

গ্যারেজে গাড়ি সাফ করছিলো শফার। স্বয়ং বেগম সাহেবাকে দেখে তার তো চক্ষু স্থির। তিনি এখানে? কিন্তু কিছু বলার ক্ষমতা নেই। গাড়িতে উঠে পেছনের দিকে হেলান দিয়ে

বসলো লিণ্ডা। পরণে সাদা মাটা পোশাক। হাতে সেই হ্যাণ্ড ব্যাগটা। ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিলো। সোফিয়া আর পারভীনের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় খুব খারাপ লাগলো লিণ্ডার। কিন্তু কি করবে। কিছু করার নেই। গাড়িটা বিশাল প্রাঙ্গনের বাইরে আসতেই রিয়ার ভিউ মিররে ভেসে উঠলো বিশাল সুন্দর সাদা রঙের বাড়িটির প্রতিবিম্ব। চোখ দুটো কেন যেন অশ্রু সজল হয়ে এলো ওর।

গাড়ি বিমান বন্দরের কাছে এলে লিণ্ডা বললো, একটু নামবো। এয়ারপোর্ট থেকে কিছু দরকারী জিনিস কেনাকাটা করতে হবে।'

'সি লেল্লাহ।' বলে প্রভু পত্নীকে নামিয়ে দিয়ে নিজের সিটে গ্যাট হয়ে বসে জিরোতে লাগলো ড্রাইভার। লিণ্ডা ভিতরে গিয়ে কাউন্টারের দিকে এগোলো। দেশে ফেরার ব্যাপারে সমস্ত প্রস্তুতি সে ইতিমধ্যেই শেষ করে রেখেছে। একটু পরেই ছেড়ে দিলো প্লেন। লিণ্ডা এসে পৌঁছলো লণ্ডনে।

কিন্তু করিম এসে লণ্ডনেই পাকড়াও করলো তাকে। বেশ কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা। লিণ্ডাকে খুঁজতে খুঁজতে এক অর্কেষ্ট্রায় গিয়ে করিম তার খোঁজ পায়। লিণ্ডা সেখানে চাকরি নিয়েছে।

'কী ব্যাপার, পালিয়েছো কেন ?'

'পালাবো না তো কি করবো? মিথ্যেবাদীর সংসারে কোন ভদ্রমহিলা বউ হয়ে থাকে? পাশপোর্ট ডুবে গেছে, তাই না।'

'তুমি যা খুশি তা বলতে পারো। আমি স্রেফ তোমাকে পাবার জন্যেই মিথ্যা কথা বলেছি।'

'তুমি এখন কি করতে চাও।'

'কি আবার করবো। আমার বউ আমি নিয়ে যাবো।'

'যদি না যাই?'

'মামলা ঠুকে দেবো। দরকার হলে মাফ চাইবো তোমার কাছে।'

'চলো তাহলে, চাচা চাচীর সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দেবো। যাবে?'

'একশো বার যাবো।'

'তোমার সঙ্গে যেতে পারি—আমি।' লিণ্ডা হঠাৎ রহস্যময় এক ভ্রু ভঙ্গী করলো করিম আল খালিদের দিকে চেয়ে।

'তাহলে চলো। আর দেরী করে লাভ কি?'

'একটি শর্ত আছে। সেই শর্তটা মানলে তবে যাবো।'

'কী শর্ত?'

'আমাকে সত্যি সত্যি তুমি ভালোবাসো কিনা আমার গা ছুঁয়ে তা বলতে হবে। জীবনে কোনোদিন এই কথাটা তোমার মুখ থেকে কখনো বেরোয়নি।'

চুপ করে রইলো করিম আল খালিদ। তার মুখে কোনো কথা নেই। কিন্তু চোখ দু'টি কি আর্দ্র? লিণ্ডা স্তম্ভিত হয়ে গেলো। পাথরের চোখে জল! এ কি করে সম্ভব।

'কী হলো? কথা বলছো না কেন?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

আবু কায়সার অনূদিত অন্যান্য বই

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

সেক্সাস

হেনরী মিলার

দাম : ২য় মুদ্রণ তেইশ টাকা

সেক্সাস। নামেই যার পরিচয়। হেনরী মিলারের 'দি রোজি ক্রুশিফিক্সিয়ন' শীর্ষক ট্রিলজির প্রথম এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সেক্সাস' বহু ভাষায় অনুদিত হয়ে লাখ লাখ কপি বিক্রি হলেও বাংলা ভাষায় এই প্রথম। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের দিক দিয়ে সেক্সাসের জুড়ি নেই।

সমালোচকদের তুখোর সমালোচনায় অতিরিক্ত যৌন-বিবরনের অভিযোগ এনে বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও গুণী-জনদের চাপে সেই ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়।

প্রসাদগুণ সম্পন্ন এ উপন্যাসে শিল্পময়তার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে মানব মানবীর জীবন-রহস্য।

প্রসাদ-নগরী নিউইয়র্কের পট-ভূমিতে লেখা এই উপন্যাসে অকপটে বিধৃত হয়েছে সদ্য ত্রিশোত্তর এক মার্কিন যুবার দৈনন্দিন রেখাচিত্র। যৌনতায় সে স্বতস্ফূর্ত। কিন্তু দেহ-সর্বস্ব নয়। নারীর শীৎকারের ভিতর থেকে সে চয়ন করে নেয় সোনালি সিংহের জীবন-দর্শন।

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

নেক্সাস

হেনরী মিলার

দাম : ১৮·০০ টাকা

দ্বিগ-বিজয়ী কথাশিল্পী হেনরী মিলারের প্রথম ট্রিলজি 'দি রোজী ক্রুশিফিক্সিয়ন' বেরুতেই লক্ষ লক্ষ পাঠক হুমড়ি খেয়ে পড়লো। নিমেষেই শেষ হয়ে গেলো লক্ষাধিক কপির প্রথম মুদ্রণ। কিন্তু সমালোচকরা আরো সোচ্চার হলেন। কঠোর-ভাবে নিন্দাবাদ করলেন—'পৃথিবীতে এর চেয়ে বড়ো পর্ণো-গ্রাফী আর হয় না।'

ট্রিলজি-র ভাগ্য গড়ালো আদালতে। কিন্তু পাঠকের রায়-ই চূড়ান্ত। শ্লীলতা-অশ্লিলতা আপেক্ষিক শব্দ।
শৃঙ্খলমুক্ত হলো ট্রিলজি।

তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী নিয়ে রচিত ট্রিলজিতে সেক্সাসের পরেই 'নেক্সাস'এর স্থান। কিন্তু উপভোগ্যতায় এটি সেক্সাসকেও ছাড়িয়ে গেছে।

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

কর্কটক্রান্তি

হেনরী মিলার

দাম: ২য় মুদ্রণ কুড়ি টাকা

প্যারিস। আলোর উৎসবে চারিদিক ঝলমলে। শ্যাম্পেন, সিগার আর আনন্দে রমরমা এর দিন আর রাত। অবিশ্রাম চলছে গান আর নাচের আসর এবং নারী-পুরুষের অবাধ উদ্দাম মেলামেশা।

কিন্তু এরই ভেতরে জেগে উঠেছে আরেক অন্ধকারের জগত। যেখানে অসংখ্য উদ্ভত নখের সামনে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে যন্ত্রণাকাতর নিরিহ ইহুদীরা। বিকৃত আর স্বাভাবিক যৌনতার পেছনে ছুটছে মানুষ। শয্যায় দেহ-ব্যবসায়িনীরা করছে অদ্ভুত আচরণ।

আরেক প্যারিস এটা। আর এখানেই বিচিত্র জীবন যাপন করছে এক যুবক। সে চাপা পড়ে গেছে পাশ্চাত্যের জাক-জমকপুর্ণ ভোগবাদী সভ্যতার তলায়। আশ্চর্য এক বিদ্রোহী সে—অপরের টাকায় খাচ্ছে বিলাসবহুল হোটেলে, অন্য মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করছে স্ত্রীর টাকায়, অবিরাম গালি দিয়ে চলেছে নিজেকে এবং চারপাশের সবাইকে।

ফিরে আসার আর কোনো পথ নেই ওর।